Islami Ain O Bichar
Vol. 13, Issue 51 & 52
July-Sept. & Oct.-Dec. 2017

ইসলামী বিধানে অগ্রাধিকার নির্ধারণ নীতিঃ একটি পর্যালোচনা

Prioritization policy in Islamic Law: An Analysis

Ahmad Ali*

ABSTRACT

Due to his natural weakness and intellectual imperfection, human being is not always able to properly perform his duties and responsibilities in many places and situations. Therefore, it is necessary for an individual to know the hierarchy of time and place to accomplish a task or to avoid it based on priority. This science is called 'Fiqhul Awlawiyyāt' in the modern terminology of Islamic jurisprudence. This paper in adopting an analytical and descriptive method, discusses the definition, importance, authenticity and demerits of lack of understanding the science of priorities (the priorotology). It also discusses the methods of how Muslim scholars prioritized the issues, set forth conditions and capabilities for so doing, and finally theorized the science of priorities.

Keywords: priority (أولوية), Islamic law, objectives of sharī`ah, preference (ترجيح), public Interest.

সারসংক্ষেপ

বাস্তবতা হলো, মানুষের পক্ষে সব সময়, সব স্থানে ও সকল পরিস্থিতিতে তার সকল কাজ ও দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। এটি মানুষের সহজাত সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা। এ কারণে একজন মানুষকে কখন কোথায় কোন্ কাজটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পাদন করতে হবে, অনুরূপভাবে কখন কোথায় কোন্ কাজটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বর্জন করতে হবে- তা জানা একান্ত প্রয়োজন। এরূপ জ্ঞানকে ইসলামী আইনের আধুনিক পরিভাষায় 'ফিকহুল আউলাভিয়্যাত' (فقه الأولويات) বলা হয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বিশ্লেষণ ও বর্ণনামূলক পদ্ধতিতে ফিকহুল আউলিয়াত-এর পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা, অগ্রাধিকার বিচার সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাবজনিত নানা অশুভ পরিণাম, অগ্রাধিকার দানের ক্ষেত্রে ইমামগণের অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ এবং অগ্রাধিকার বিচারের যোগ্যতা ও শর্তাবলি প্রভৃতি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

মূলশব্দঃ অগ্রাধিকার, ইসলামী আইন, শরী'আহর উদ্দেশ্য, তারজীহ (প্রাধান্য), জনকল্যাণ।

* Dr. Ahmad Ali is a professor of Islamic Studies, University of Chittagong, Bangladesh, emil : drahmadiscu@gmail.com

ভূমিকা

সকল কাজের মর্যাদা, গুরুত্ব ও তাৎপর্য এক ও অভিন্ন নয়। কাজগুলোর মধ্যে কোনোটি মৌলিক, কোনোটি উপজাত; কোনোটি সাধারণভাবে কাম্য, আবার কোনোটি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ; কোনোটি উপকারী, আবার কোনোটি অধিকতর উপকারী; কোনোটি মর্যাদাসম্পন্ন, আবার কোনোটি অধিকতর মর্যাদাসম্পন্ন; কোনোটি সাধারণ তাৎপর্যবহ, কোনোটি অধিকতর তাৎপর্যবহ। পক্ষান্তরে কোনো কাজ অশোভনীয় ও অসুন্দর, আবার কোনো কাজ নিষিদ্ধ ও গর্হিত; কোনো কাজ ক্ষতিকর, আবার কোনো কাজ অধিকতর ক্ষতিকর; ...। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ইসলামী আইনতত্ত্ববিদ ড. ইউসূফ আল-কারযাভী বলেন,

> إن القيم والأحكام والأعمال والتكاليف متفاوتة في نظر الشرع تفاوتا بليغا، وليست كلها في رتبة واحدة، فمنها الكبير ومنها الصغير، ومنها الأصلي ومنها الفرعي، ومنها الأركان ومنها المكملات، ومنها ما موضعه في الصلب وما موضعه في الهامش، وفيها الأعلى والأدنى والفاضل والمفضول.
>
> সকল মূল্যবোধ, বিধিবিধান, কর্মকা- ও দায়িত্ব শারী'আতের দৃষ্টিকোণ থেকে এক ও অভিন্ন নয়। এগুলোর মধ্যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে। এসব সমমর্যাদাসম্পন্ন নয়। তন্মধ্যে কিছু বড়, কিছু ছোট; কিছু মৌলিক, কিছু উপজাত; কিছু মৌলিক উপাদান, কিছু সম্পূরক উপাদান; কিছুর জায়গা হলো টেক্সটের ভেতর, কিছুর জায়গা হলো পাদটীকায়; কিছু কিছু শ্রেষ্ঠতর, কিছু সাধারণ (Al-Qaradāwī 2000, 9)।

উল্লেখ্য যে, একজন ঈমানদার ব্যক্তির দায়িত্ব হলো, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত সকল কাজ- ছোট হোক বা বড়; ফরয হোক বা ওয়াজিব; সুন্নাত হোক বা নফল, পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করে যাবে, অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল স. কর্তৃক নিন্দনীয় ও অসুন্দর হিসেবে চিহ্নিত সকল কাজ-ছোট হোক বা বড়; হারাম হোক বা মাকরূহ, বর্জন করে চলবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মানুষের পক্ষে সব সময়, সব স্থানে ও সকল পরিস্থিতিতে তার সকল কাজ ও দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অনুরূপভাবে সব সময় ও সকল পরিস্থিতিতে সকল অসুন্দর ও নিষিদ্ধ কাজ বর্জন করাও সম্ভবপর হয় না। এটি মানুষের সহজাত সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা। আল্লাহ তা'আলাও তাঁর বান্দাদেরকে

তাদের সাধ্যানুযায়ী তাঁর বিধিনিষেধ মেনে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ "তোমরা আল্লাহকে তোমাদের সাধ্যানুযায়ী ভয় করো" (Al-Qurān, 64:16)। রাসূলুল্লাহ স. বলেন, إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم- "যখন আমি তোমাদেরকে কোনো কাজের আদেশ দেবো, তখন তোমরা সাধ্যমতো তা পালন করবে" (Al-Bukhārī 2002, 1800,7288)। এ কারণে একজন মু'মিনকে কখন, কোথায় কোন্ কাজটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পাদন করতে হবে, অনুরূপভাবে কখন, কোথায় কোন্ কাজটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বর্জন করতে হবে- তা জানা একান্ত প্রয়োজন, যাতে কোথাও যদি একান্তই একসাথে সকল কাজ ও দায়িত্ব পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক কাজটি সম্পাদন করা যায়, অনুরূপভাবে কোথাও যদি সকল অশোভন ও গর্হিত কাজ থেকে বিরত থাকা অসম্ভব হয়, তাহলে অধিকতর গর্হিত ও ক্ষতিকর কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা যায়। এরূপ জ্ঞানকে ইসলামী আইনের আধুনিক পরিভাষায় *'ফিকহুল আউলাভিয়্যাত'* (কাজের অগ্রাধিকার বিচারনীতি) বলা হয়। নিম্নে *'ফিকহুল আউলাভিয়্যাত'* -এর পরিচয়, গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা, অগ্রাধিকার দান ও অগ্রাধিকার নির্ধারণের নীতিমালা ও শর্তাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ফিকহুল আউলাভিয়্যাত-এর পরিচয়

'ফিকহুল আউলাভিয়্যাত' (فقه الأولويات) পরিভাষাটি দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। একটি হলো- فقه (ফিকহ)। এর শাব্দিক অর্থ হলো- তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি (الفهم الدقيق), সূক্ষ্ম উপলব্ধি (الإدراك الدقيق) ও গভীর বোধ (الفهم العميق)। প্রচলিত পরিভাষায় 'ফিকহ' বলতে কুর'আন ও হাদীস থেকে রায় ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে বেরকৃত মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত বিধিবিধান সংক্রান্ত জ্ঞানকেই বোঝানো হয়। অপর শব্দটি হলো-الأولويات (আউলাভিয়্যাত)। এটি الأولوية শব্দের বহুবচন। এটি শ্রেষ্ঠত্বজ্ঞাপক বিশেষণ (superlative adjective) أولى শব্দ থেকে গঠিত কৃত্রিম [artificial] মাস্‌দার (مصدر صناعي)। আভিধানিকভাবে أولى শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি হলো-أجدر وأحق (সর্বাধিক উপযুক্ত ও হকদার) ও অপর অর্থ হলো- أقرب (নিকটতম)। পবিত্র কুর'আন ও হাদীসের নানা জায়গায় শব্দটি এসব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (Al-Qurān, 3:68; 4:135; 8:75; 19:70; 33:6)।

এ পরিভাষাটি একান্তই সাম্প্রতিক ও আধুনিক ফিকহগবেষকগণের উদ্ভাবিত। আমাদের পূবসূরি ফকীহদের মধ্যে এ পরিভাষার ব্যবহার দেখা যায় না। তবে এ পরিভাষা দ্বারা যা বোঝানো হয়- এরূপ অনেক শব্দ[১] ও মর্ম তাঁদের গ্রন্থগুলোতে

১. যেমন- أفضل،أحسن،أرجح، أولى، أرفق، أنفع، أصلح. প্রভৃতি।

পাওয়া যায়। যেমন ইমাম আবুল কাসিম আর-রাগিব আল-ইস্পাহানী [মৃ. ৫০২ হি.] রহ.বলেন,

> لا يصح تعاطي الفضل إلا بعد العدل، فإن العدل فعل ما يجب والفضل الزيادة على ما يجب، وكيف يصح تصور الزيادة على شيء هو غير حاصل في ذاته؟ ولهذا قيل لا يستطيع الوصول من ضَيَّع الأصول.. فمن شَغَلَهُ الفرض عن الفضل فمعذور، ومن شغله الفضل عن الفرض فمغرور.
>
> আদল' অবলম্বন ব্যতীত 'ফাদল' অবলম্বন সমীচীন নয়। 'আদল' হলো কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করা, আর 'ফাদল' হলো কর্তব্যকর্মের অতিরিক্ত কিছু সম্পাদন করা। কাজেই যে (প্রয়োজনীয়) কাজটি আজো অর্জিত হয়নি, সেক্ষেত্রে এর অতিরিক্ত কিছু সম্পাদনের কল্পনা করাও কীভাবে বিশুদ্ধ হতে পারে? এজন্য বলা হয়, যে ব্যক্তি মৌলিক বিষয়গুলো ধ্বংস করেছে, তার পক্ষে গন্তব্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। .. কাজেই ফরয (কর্তব্যকর্ম) যাকে ফাদল (অতিরিক্ত কর্ম) সম্পাদন থেকে বিরত রেখেছে সে সমস্যাপীড়িত, পক্ষান্তরে অতিরিক্ত কর্ম (যেমন- নফল) যাকে ফরয (কর্তব্যকর্ম) থেকে বিরত রেখেছে সে প্রবঞ্চিত (Al-Iṣfahānī 1980, 34-35)।

এ কথা থেকে বোঝা যায় যে, আমরা *'ফিকহুল আউলাভিয়্যাত'* বলতে যা বোঝাই, তা তাঁর কথারই প্রলম্বিত নামকরণ মাত্র।

পূবসূরি ফকীহগণ তাঁদের এ জাতীয় ভাবকে নির্দিষ্ট পরিভাষা দ্বারা ব্যক্ত করতে কিংবা *'আউলাভিয়্যাত'*-এর বিধিবদ্ধ সংজ্ঞা পেশ করতে মনোযোগ না দেয়ার দুটি কারণ হতে পারে। যেমন-

এক. এ বিষয়ক মাস'আলাগুলো তখনো স্বতন্ত্র শাস্ত্রীয় রূপ পরিগ্রহ করেনি; বরং প্রত্যেক অধ্যায়ের মাঝে মাঝে এ বিষয়গুলো প্রসঙ্গক্রমে আলোচনা করা হয়েছে।

খ. এ শব্দের অর্থ এতো বেশি সুস্পষ্ট যে, একে সংজ্ঞায়িত করার কোনো প্রয়োজনীয়তা তখনো অনুভূত হয়নি। কোনো প্রসঙ্গেই যদি বলা হতো যে, أولى بكذا, তবে সকলেই বোঝে নিতো যে, এটিই অগ্রগণ্য।

আধুনিক ফিকহগবেষকগণ নানাভাবে একে সংজ্ঞায়িত করেছেন। যেমন-

ড. মুহাম্মাদ আল-ওয়াকিলী বলেন,

> أنها الأعمال الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها عند الامتثال أو عند الإنجاز.
>
> আউলাভিয়্যাত হলো, এমন সব শার'য়ী কার্যকলাপ, যেগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পালন কিংবা কার্যকর করতে হয় (Al-Wakīlī 1997, 15)।

ড. ইউসূফ আল-কারযাভী একে দু জায়গায় দুভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন-

এক. وضع كل شيئ في مرتبته؛ فلا يؤخر ما حقه التقديم أو يقدم ما حقه التأخير، ولايصغر الأمر الكبير، ولا يكبر الأمر الصغير.

প্রত্যেকটি বিষয়কে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থাপন করা। যাকে অগ্রবর্তী করা দরকার, তাকে পশ্চাৎবর্তী করা হবে না, যাকে পশ্চাৎবর্তী করা দরকার, তাকে অগ্রবর্তী করা হবে না। আর বড় বিষয়কে ছোট করে দেখা হবে না, আর ছোট বিষয়কে বড় করে দেখা হবে না (Mulhim 2008, 40)।

দুই. وضع كل شيئ في مرتبته بالعدل من الأحكام والقيم والأعمال، ثم يقدم الأولى فالأولى بناء على معايير شرعية صحيحة.. فلا يقدم غير المهم على المهم، ولا المهم على الأهم، ولا المرجوح على الراجح، ولا المفضول على الفاضل أو الأفضل.

প্রত্যেকটি বিষয়কে ন্যায়ানুগভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় স্থাপন করা, তা বিধিবিধান হোক কিংবা মূল্যবোধ হোক অথবা কার্যকলাপ হোক। অতঃপর বিশুদ্ধ শার'য়ী মানদ-গুলোর ভিত্তিতে গুরুত্ব অনুসারে এগুলোকে যথাক্রমে অগ্রাধিকার দেওয়া। কাজেই অগুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া যাবে না, অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না, অনুরূপভাবে দুর্বল মত (المرجوح) কে অগ্রগণ্য (الراجح) মতের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না এবং সাধারণ বিষয়কে শ্রেষ্ঠ কিংবা শ্রেষ্ঠতম বিষয়ের ওপর প্রাধান্য দেয়া যাবে না (Al-Qaradāwī 2000, 9)।

উল্লেখ্য যে, ড. ইউসূফ আল-কারযাভীর প্রদত্ত এ দুটি সংজ্ঞা একেতো দীর্ঘ, তাছাড়া এগুলো ব্যাপকতাজ্ঞাপক; ফিকহের জন্য সুনির্দিষ্ট নয়। এগুলোতে ফিকহী বিষয়গুলো ছাড়াও দীনের অন্যান্য বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণে কেউ কেউ একে ফিকহের সাথে সুনির্দিষ্ট করে এভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন,

العلم بالأحكام الشرعية التي لها حق التقديم على غيرها بناء على العلم بمراتبها، وبالواقع الذي يتطلبها

শারী'আতের বিধিবিধানসমূহের মর্যাদাগত অবস্থান ও বাস্তবতার দাবি সংক্রান্ত সম্যক জ্ঞান ও উপলব্ধির ভিত্তিতে অগ্রাধিকারমূলক বিধিবিধান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা (Al-Wakīlī 1997, 16)।

গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা

কুর'আনের বহু আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস থেকে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, শারী'আতের সকল আদেশ-নিষেধের গুরুত্ব সাধারণত একই রূপ নয়। অনুরূপভাবে

সকল কাজের মর্যাদাও সমান নয়। তাই প্রত্যেকের একান্ত কর্তব্য হলো- আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ-নিষেধের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুধাবন করে সময়-স্থান-পরিস্থিতি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এমন বিষয় এখতিয়ার করবে, যা তার জন্য, তার সমাজের জন্য ও জাতির জন্য সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করে এবং যা তাকে, তার সমাজ ও জাতিকে সমূহ ক্ষতি থেকে রক্ষা করবে। নিম্নে উদাহরণস্বরূপ এতদসংশ্লিষ্ট কয়েকটি কুর'আনের আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হলো-

ক. আল-কুর'আন

ক.১. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ﴾

তোমাদের রব্ব-এর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে যে সর্বোত্তম বিধান অবতীর্ণ করা হয়েছে, তোমরা তার অনুসরণ করো (Al-Qurān, 39:55)।

এ আয়াতে উল্লেখিত 'أَحْسَنَ' শব্দের দুটি অর্থ হতে পারে। এক. অপেক্ষাকৃত উত্তম বিধান। এ অবস্থায় এ আয়াতের মর্ম দাঁড়াবে, যখন তোমরা বিভিন্ন বিধিবদ্ধ বিষয় থেকে যে কোনো একটি বিষয় অবলম্বনের মুখোমুখি হও, তবে তোমরা অপেক্ষাকৃত উত্তম বিষয়টিই গ্রহণ করবে। যেমন-ক্ষমা প্রদর্শন ও কিসাস গ্রহণ; অনুরূপভাবে ধৈর্যধারণ ও প্রতিশোধ গ্রহণ। দুই. আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় আদেশাবলি। এগুলো যেহেতু নিষেধাবলির তুলনায় অধিক কল্যাণকর, তাই এগুলোকে 'অধিক উত্তম' বলা হয়েছে। বিশিষ্ট ফকীহ আবূ বাক্র ইবনুল 'আরাবী [৪৬৮-৫৪৩ হি.] রাহ. বলেন,

أَنَّ الْحَسَنَ مَا وَافَقَ الشَّرْعَ، وَالْقَبِيحَ مَا خَالَفَهُ، وَفِي الشَّرْعِ حَسَنٌ وَأَحْسَنُ، فَقِيلَ: كُلُّ مَا كَانَ أَرْفَقَ فَهُوَ أَحْسَنُ .وَقِيلَ: كُلُّ مَا كَانَ أَحْوَطَ لِلْعِبَادَةِ فَهُوَ أَحْسَنُ .

'হাসান' (ভালো) হলো- যা শারী'আতসম্মত। আর 'কাবীহ' (মন্দ) হলো, যা শারী'আত পরিপন্থী। শারী'আতের মধ্যে যেমন 'হাসান' (ভালো বিষয়)ও আছে, তেমনি 'আহসান' (অধিকতর কিংবা সর্বাধিক ভালো বিষয়) ও আছে। এ কারণে বলা হয় যে, যা সবচেয়ে বেশি উপকারী তা 'আহসান'। কারো মতে, যে বিষয়ে 'ইবাদতের অনুভূতি সবচেয়ে বেশি প্রকাশ পায়, সেটিই 'আহসান .. (Ibn al-'Arabī 2002, 2/323)।

ক.২. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾

তোমরা যা কিছু দান করো, তা যদি প্রকাশ্যভাবে (মানুষদের সামনে) করো, তা ভালো কথা (তাতে কোনো দোষ নেই), তবে যদি তোমরা তা (মানুষদের কাছে) গোপন রাখো এবং (চুপে চুপে) অভাবীদের দিয়ে দাও, তা হবে তোমাদের জন্য উত্তম (Al-Qurān, 2:271)।

এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, প্রকাশ্যেও সাদাকা করা যায় এবং সংগোপনেও সাদাকা করা যায়। তবে সংগোপনে ও চুপিসারে সাদাকা করা অনেক উত্তম ও প্রশংসনীয় কাজ।

ক.৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾

আত্মীয়স্বজনরা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী একে অন্যের তুলনায় (উত্তরাধিকারের) বেশি হকদার (Al-Qurān, 8:75)।

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করার ক্ষেত্রে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কে কার চেয়ে অগ্রগণ্য, তা বর্ণনা করেছেন। তদুপরি এ আয়াতে এ অগ্রগণ্যতা বোঝানোর জন্য 'أَوْلَى' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা থেকে একদিকে বিভিন্ন বিষয়ে অগ্রাধিকার দানের বিধিবদ্ধতা জানা যায়, অপরদিকে *'ফিকহুল আউলাভিয়্যাত'* শীর্ষক পরিভাষার যথার্থতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

খ. আল-হাদীস

খ.১. আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

الإيمان بضعو سبعون؛ فأفضلها قو ل لاإله إ لا الله، وأدنا ها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من ا لإيمان.

ঈমানের সত্তরোধিক শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শাখা হলো- এ মর্মে স্বীকৃতি দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হলো- পথ থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানো। অধিকন্তু, লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা (Muslim 2006, 1/38, 58)।

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, দীনের সকল বিষয় সমমর্যাদা সম্পন্ন নয়; এগুলোতে মর্যাদাগত তারতম্য আছে।

খ.২. আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ স. থেকে জানতে চাওয়া হয়, কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি জবাব দেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান। তাঁকে আবার জিজ্ঞেস করা হয়, এরপর কোনটি? তিনি জবাব দেন, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ। তাঁকে আবারো জিজ্ঞেস করা হয়ে, এরপর কোনটি? তিনি জবাব দেন, মাবরূর হজ্জ (Al-Bukhārī 2002, 16,26)।[২]

২. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل فقال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور.

এ হাদীস থেকেও সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে, বিভিন্ন কাজের মধ্যে মর্যাদাগত তারতম্য রয়েছে এবং কোনো কোনো কাজ অপর কাজের চেয়ে অগ্রগণ্য।

খ.৩. ইবনু 'আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ স. বলেন,

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فما بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ.

'ফারা'য়িয (মীরাসের প্রাপ্য অংশ) তার প্রাপকদেরকে দিয়ে দাও। এরপর যা বাকী থাকে তা পাবে নিকটবর্তী পুরুষ স্বজন (Al-Bukhārī 2002, 1668, 6732)।

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মীরাসের ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে *'আসহাবুল ফুরূয'* তার অন্য আত্মীয়-স্বজনের চেয়ে অগ্রগণ্য এবং মীরাসের নির্দিষ্ট অংশগুলো দেয়ার পর অবশিষ্ট অংশের ক্ষেত্রে 'আসাবাদের মধ্যে কেউ কেউ অপর জনের চেয়ে অধিকতর হকদার।

অগ্রাধিকার বিচার সংক্রান্ত জ্ঞানের অভাবজনিত পরিণাম

বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্য বিচারের জ্ঞান না থাকলে নানারূপ অকল্যাণ ও ক্ষতি হতে পারে। ব্যক্তি যেমন এ অকল্যাণ ও ক্ষতির সম্মুখীন হবে, সমাজও তা থেকে রক্ষা পাবে না। নিম্নে এরূপ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি ও অকল্যাণের কথা উল্লেখ করা হলো-

ক. শারী'আত সম্পর্কে অমূলক ধারণার প্রসার লাভ

যে কোনো কাজের যথার্থ প্রায়োগিক ক্ষেত্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা না থাকার কারণে অনেক সময় মানুষ শারী'আতের নির্দেশ মনে করে এমন অনেক কাজ করতে পারে, যা সময় বা স্থান বা অবস্থা উপযোগী নয়। এতে যে বিশৃঙ্খল ও ক্ষতিকর অবস্থা তৈরি হবে, তাতে অনেকের মধ্যে শারী'আত সম্পর্কে অমূলক ও বাজে ধারণা প্রসার লাভ করবে। বলাই বাহুল্য, শারী'আতের বিধিবিধানসমূহের মধ্যে একটি সুন্দর ভারসাম্য রয়েছে এবং এর অনেক বিধান সময়-স্থান ও অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ করে প্রণীত হয়েছে। তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থা অবলম্বনেরও অনুমোদন রয়েছে। কাজেই এ ভারসাম্য ও সঙ্গতি নষ্ট করা সমীচীন নয়। যেমন- যে কোনো ঔষধ ব্যবহারের একটি সুনির্দিষ্ট বিধি আছে। দিনে কতবার, কোন্ কোন্ সময়, কী পরিমাণ এবং কীভাবে তা সেবন করতে হবে- তা সবকিছু সুনির্দিষ্ট থাকে। কেউ যদি তা মেনে না চলে, তাহলে এতে যে কোনো ধরনের বিরূপ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

খ. মৌলিক বিষয়ের পরিবর্তে অপ্রধান বিষয়ের গুরুত্ব বৃদ্ধি

কাজের মর্যাদাগত তারতম্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে অনেকের কাছে মৌলিক বিষয়সমূহের গুরুত্ব হ্রাস পাবে, পক্ষান্তরে ছোটখাট বিষয়গুলোর গুরুত্ব

বেড়ে যাবে। বাস্তবেও আমরা সমাজের কিছু লোকের মধ্যে এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করছি। অনেকেই আছেন, যারা নামাযে হাত বাঁধার স্থান, তাশাহ্হুদ পড়ার সময় আঙ্গুল সঞ্চালনের পদ্ধতি, রুকুতে যেতে ও উঠতে হাত তোলা, জোরে আমীন বলা, 'ঈদের তাকবীরের সংখ্যা প্রভৃতি বিষয়কে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং এসব নিয়ে কেউ কেউ অতি বাড়াবাড়িতেও নিমজ্জিত হন। অথচ এর চেয়েও অধিকতর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজের প্রতি তাদের কোনো নজর নেই।

গ. বাহ্যিকতা ও আনুষ্ঠানিকতার গুরুত্ব বৃদ্ধি

কাজের মর্যাদাগত তারতম্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে অনেকের কাছে কাজের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের তুলনায় কাজের বাহ্যিকতা ও আনুষ্ঠানিকতার গুরুত্ব বেড়ে যায়। এ কারণে আমরা লক্ষ্য করি যে, অনেকেই সালাতুত তারাবীহ-এর রাক'আতের সংখ্যা নিয়ে যেভাবে কথা বলেন, অথচ এ সালাত কীভাবে আদায় করা হচ্ছে এবং আদায় করার সময় মানুষের বিনয়ানুভূতি কীরূপ থাকে-এসব বিষয়ে তারা কোনো কথা বলেন না। অনুরূপ দেখা যায় যে, কেউ কেউ অনেক দাম দিয়ে বড় পশু ক্রয় করে কুরবানী করেন, অথচ তার কাছে কুরবানীর শিক্ষা ও তাৎপর্যের কোনো দাম নেই। আরো দেখা যায়, কেউ কেউ রাসূলুল্লাহ স.-এর মহব্বতের নামে কাড়ি কাড়ি টাকা বিশেষ দিনে সাজসজ্জায় ও মিছিলে ব্যয় করেন, অথচ তার কাছে রাসূলুল্লাহ স.-এর শিক্ষা মেনে চলার কোনো গুরুত্ব নেই। ইমাম শাফি'য়ী রহ. কতোই চমৎকার কথা বলেছেন!

لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع

যদি তোমার ভালোবাসা নিখুঁত হতো, অবশ্যই তুমি তাঁর শিক্ষা মেনে চলতে। কেননা, যারা সাচ্চা প্রেমিক হয়, তারা প্রেমাস্পদের একান্ত বাধ্যগত হয় (Ibnu `Abdil Barr ND, 86)।

ঘ. সামাজিক 'ইবাদতের গুরুত্ব হ্রাস

কাজের মর্যাদাগত তারতম্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে অনেকের কাছে একদিকে ব্যক্তিগত পর্যায়ে নফল ইবাদত ও যিকর-আযকারের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে সমাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত ও জনহিতকর কার্যসাধনের গুরুত্ব হ্রাস পায়। এ কারণে আমরা লক্ষ্য করি যে, অনেকেই নিয়মিত নফল নামায-রোযা, তিলাওয়াত-যিকর-আযকার আদায় করেন, কিন্তু তাদের কাছে যথাযথ হিসাব করে যাকাত আদায় করা, পিতামাতার সেবা করা, আত্মীয়-স্বজনদের খোঁজখবর নেওয়া, প্রতিবেশীদের সাথে সদাচরণ করা, পেশাগত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করা এবং দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্য-সহযোগিতার করা প্রভৃতি কাজের কোনো গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় না।

ঙ. কাজের মর্যাদাগত অভিন্নতার ধারণা বিস্তার লাভ

কাজের মর্যাদাগত তারতম্য সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে সমাজের মধ্যে ক্রমে এরূপ ধারণা বিস্তার লাভ করবে যে, শারী'আতের সকল কাজের মর্যাদা এক ও অভিন্ন। এ কারণে অনেকেই অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর কাজ ছেড়ে ছোট ছোট কাজের তালাশে লেগে থাকবে এবং এগুলোর মাধ্যমে নাজাত পেতে সচেষ্ট হবে।

চ. 'আমালের পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হওয়া

কাজের মর্যাদাসম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে অনেকেই অধিকতর গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ ছেড়ে ছোট ছোট কাজের প্রতি যত্নশীল হয়ে থাকে এবং এ জন্য কঠোর পরিশ্রমও করে থাকে। যেমন- ফরয ছেড়ে নফলের প্রতি একান্ত মনোযোগী হওয়া। এতে একদিকে অধিকতর গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ করে বিরাট পুণ্য লাভের সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যায় এবং অপরদিকে অধিকতর গুরুত্ব ও মর্যাদাপূর্ণ কাজ ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার ছোট ছোট কাজগুলো পণ্ডশ্রমও হয়ে যেতে পারে।

ছ. ক্ষতি ও মর্যাদাহানির উপলক্ষ

কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবের কারণে কেউ যখন অধিকতর উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ বাদ দিয়ে সাধারণ ও ছোট ছোট কাজে জড়িয়ে পড়ে, তখন সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং ক্রমশ তার মর্যাদা ও সম্মান বৃদ্ধির পরিবর্তে হ্রাস পেতে থাকে। এ কারণে ইমাম আবূ 'উবাইদা রহ. বলেন, "যে ব্যক্তি নিজেকে অগুরুত্বপূর্ণ কাজের মধ্যে জড়িয়ে রাখলো, সে তার গুরুত্বপূর্ণ কাজকে ক্ষতিগ্রস্ত করলো" (Al-Baghdādī ND, 2/160)। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম [৬৯১-৭৫১ হি.] রহ. মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশ্যে শয়তানের রচিত মারাত্মক ফাঁদসমূহের মধ্যে একে ষষ্ঠ ফাঁদ হিসেবে গণ্য করেছেন। তিনি বলেন,

العقبة السادسة: عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، فأمره بها، وحسنها في عينه، وزينها له، وأراه ما فيها من الفضل والربح؛ ليشغله بها عما هو أفضل منها، وأعظم كسبًا وربحًا؛ لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كماله وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضى له ... ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولى العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها، وأعطوا كل ذي حق حقه.

ষষ্ঠ ফাঁদ হলো, অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সাধারণ আমল। শয়তান মানুষকে এসব আমল করতে নির্দেশ দেয়, এগুলোকে তার চোখে সুন্দর ও সুসজ্জিত করে উপস্থাপন করে এবং এগুলোতে যে মর্যাদা ও লাভ রয়েছে তা তাকে দেখায়। এর

পেছনে তার উদ্দেশ্য থাকে, এর চেয়ে উত্তম এবং অধিক কল্যাণ ও লাভজনক কাজ থেকে তাকে বিরত রাখা। কারণ, সে যখন তার আসল পুণ্য নষ্ট করতে চেষ্টা করেও অসমর্থ হয়, তখন সে তার মর্যাদা, সম্মান, অবস্থান হ্রাস করতে সচেষ্ট হয়। এতদুদ্দেশে সে তাকে অধিকতর উত্তম, অগ্রগণ্য এবং আল্লাহর নিকট সর্বাধিক প্রিয় ও সন্তুষ্টজনক কাজ থেকে বিরত রেখে অনুত্তম, দুর্বল ও সাধারণ বৈধ কাজের মধ্যে ব্যস্ত করে রাখে। ...শয়তানের এ ফাঁদ কেবল সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন সত্যনিষ্ঠ 'আলিমগণই অতিক্রম করতে পারেন, যাঁরা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাওফীকপ্রাপ্ত হয়ে সঠিক পথে রয়েছেন। তাঁরা প্রত্যেকটি কাজকে যথাস্থানে রাখেন এবং প্রত্যেক হকদারকে তার যথাযোগ্য হক দান করেন (Ibn al-Qayyim 1973, 225)।

অগ্রাধিকার দানের ক্ষেত্রে ইমামগণের অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ

যদি শারী'আতের সকল আদেশ-নিষেধ একসাথে পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে এরূপ অবস্থায় কোন্ কাজটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পাদন করা প্রয়োজন- তা নির্ণয়ের জন্য আমাদের পূর্বসূরি ইমামগণ বিভিন্ন নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এ নীতি ও পদ্ধতিগুলো এখনোও সাম্প্রতিক নানা ঘটনায় স্থান-কালও অবস্থাভেদে অধিক কল্যাণকর ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে সাহায্য করতে পারে। একজন মুফতী বা ফিকহগবেষক অধিকতর সঠিক ও বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছার জন্য এসব নীতি ও পদ্ধতির মধ্যে যে কোনো একটিকেও এখতিয়ার করতে পারেন, প্রয়োজনে স্থান-সময়-অবস্থাভেদে দু বা ততোধিক নীতি ও পদ্ধতিসমূহও অবলম্বন করতে পারেন।

বস্তুতপক্ষে কাজের অগ্রাধিকার ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের ক্ষেত্রে একজন মুফতীর একান্ত অবলম্বন হলো- 'তারজীহ' (অগ্রাধিকারদান) সংক্রান্ত নিয়মাবলি, শারী'আতের উদ্দেশ্যাবলি, সমাজের বাস্তব চিত্র এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান। তবে এ ক্ষেত্রে এমন কিছু নীতি ও পদ্ধতিও রয়েছে, যা অনুসরণ করা হলে কাজগুলোকে গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে একটি ধারাবাহিক ক্রমে সাজানো যেতে পারে এবং স্থান-কাল-অবস্থা উপযোগী অধিকতর উত্তম ও কল্যাণকর কাজটি বেছে নেওয়া সম্ভব হবে।

নিম্নে ফকীহগণের অনুসৃত এরূপ কয়েকটি পদ্ধতি[৩] সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১. ইস্তিহসান (উত্তম বিবেচনা)

৩. মুজতাহিদ ইমামদের মধ্যে অনেকেই এ পদ্ধতিসমূহের মধ্যে *ইস্তিহসান*, *ইস্তিসলাহ*, *সাদ্দুয যারা'ই* ও *ই'তিবারুল মা'লাত* প্রভৃতি পদ্ধতিকে যেমন বিধিবিধান উদ্ভাবন ও নির্ধারণের দলীল হিসেবে ব্যবহার করেছেন; তেমনি তাঁদের কেউ কেউ এ পদ্ধতিগুলোকে আবার ক্ষেত্রবিশেষে শারী'আতের বিধিবদ্ধ কাজসমূহের মধ্যে অগ্রাধিকার নির্ধারণের বেলায়ও প্রয়োগ করেছেন।

২. ইস্তিসলাহ (জনস্বার্থ ও কল্যাণ বিবেচনা)

৩. সাদ্দুয যারা'ই (অন্যায়ের পথরুদ্ধকরণ)

৪. ই'তিবারুল মা'লাত (পরিণতি বিবেচনা)

৫. একান্ত প্রয়োজনে দুর্বল মতানুসারে ফাতওয়া দান

৬. তারজীহ (অগ্রাধিকার দান)-এর নীতিমালা অনুসরণ

১. ইস্তিহ্সান

'ইস্তিহসান' শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- কোনো কিছুকে ভালো ও উত্তম বিবেচনা করা। উসূলুল ফিকহ্ শাস্ত্রের পরিভাষায় ইস্তিহসান বলতে বোঝানো হয়, নির্দিষ্ট কোনো মাস'আলায় যদি সাধারণ বিধান ও যুক্তিগ্রাহ্য কোনো দলীলের চেয়ে সূক্ষ্ম ও অগ্রাধিকারযোগ্য কোনো দলীল (চাই তা নাস্ হোক, কিংবা ইজমা' বা মাসলাহাত বা জরুরত অথবা সামাজিক প্রথা বা অপ্রকাশ্য কিয়াস) পাওয়া যায়, তবেই ঐ সাধারণ বিধান ও যুক্তিগ্রাহ্য দলীল পরিত্যাগ করে সূক্ষ্ম ও অগ্রাধিকারযোগ্য দলীলের মর্মানুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। সংখ্যাগরিষ্ঠ মুজতাহিদ ইমামগণের মতে, 'ইস্তিহসান' ইসলামী শারী'আতের একটি প্রামাণ্য দলীল।[৪] তাঁরা এ নীতির ভিত্তিতে অনেক সময় জরুরত, মাসলাহাত ও 'উরফ প্রভৃতি বিবেচনা করে সাধারণ যুক্তিগ্রাহ্য বিধান ছেড়ে অধিকতর উত্তম বিধান গ্রহণ করেন। আবার কখনো তাঁরা এ নীতির ভিত্তিতে ইমামগণের মতপার্থক্যের সুযোগ (مراعاة الخلاف) নিয়ে অধিকতর কল্যাণকর ও সহজ বিধান গ্রহণ করেন। নিম্নে জরুরত, সামাজিক প্রথা, মাসলাহাত ও অপ্রকাশ্য কিয়াস প্রভৃতির ভিত্তিতে ইস্তিহসানের কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করা হলো (Ruhul Amin 2013, 131-148)।

❖ জরুরতের ভিত্তিতে ইস্তিহসান

উম্মাতের কোনো নিতান্ত প্রয়োজন পূরণের লক্ষ্যে কখনো মুজতাহিদগণ সাধারণ নীতি ও যুক্তিগ্রাহ্য দলীলের দাবি ছেড়ে প্রয়োজনের আলোকে অধিকতর উত্তম ও উপকারী সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। এরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানকে জরুরতের ভিত্তিতে ইস্তিহসান' বলা হয়। যেমন- নারীর জন্য সাধারণ বিধান হলো, সারা শরীর পর্দায় আবৃত করে রাখা। তবে নিতান্ত প্রয়োজন ও বিশেষ কারণে গায়র-মাহরামকে শরীরের অংশবিশেষ দেখানো বৈধ। যেমন- ডাক্তারকে রোগের স্থান দেখানো। মালিকীগণ

৪. হানাফী, মালিকী ও হাম্বালী ইমামগণ এ মত পোষণ করেন। তবে শাফি'য়ী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, সাধারণত ইস্তিহসান শারী'আতের দলীল হিসেবে বিবেচনার উপযোগী নয়। তবে এ মাযহাবের নানা ফাতওয়া গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে এ কথা জানা যায় যে, ইমাম শাফি'য়ী রাহ. সহ এ মাযহাবের অনেক মুজতাহিদই ইস্তিহসানের ভিত্তিতে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এরূপ ইস্তিহসানকে 'কষ্ট লাঘব ও বিধান সহজীকরণের নিমিত্তে ইস্তিহসান' নামে আখ্যায়িত করে থাকেন (Al-Shā'ibī ND,1/425)।

❖ 'উরফের ভিত্তিতে ইস্তিহসান

যদি সমাজে প্রচলিত বিশুদ্ধ কোনো প্রথার পরিবর্তে সাধারণ নীতি ও যুক্তিগ্রাহ্য দলীলের দাবি বাস্তবায়ন করা হয় এবং তাতে কোনো অসুবিধা বা ক্ষতির আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে সাধারণভাবে যুক্তিগ্রাহ্য দলীলের দাবি ছেড়ে সামাজিক প্রথা অনুযায়ী 'আমল করা হয়। এরূপ 'আমলকে 'উরফের ভিত্তিতে ইস্তিহসান' বলা হয়। যেমন- গোসলখানা ভাড়া করা। উল্লেখ্য যে, ইসলামী শারী'আতের সাধারণ বিধান হলো- যে কোনো ঘর ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাড়ার মেয়াদ ও ব্যবহারবিধি প্রভৃতি বিষয় সুস্পষ্ট করা অপরিহার্য, যাতে উভয়পক্ষ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকে এবং পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ এড়াতে পারে। এ জাতীয় অস্পষ্ট চুক্তি সহীহ নয়; কিন্তু গোসলখানা ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে যদিও পানি ব্যবহারের পরিমাণ এবং সেখানে অবস্থানের সময়কাল নির্ধারণ করা না হয়, তবুও সমাজে প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে তা ভাড়া দেওয়া বৈধ।

❖ মাসলাহার ভিত্তিতে ইস্তিহসান

জনকল্যাণ ও স্বার্থের প্রেক্ষিতে কখনো সাধারণ নীতি ও যুক্তিগ্রাহ্য দলীলের দাবি বাস্তবায়ন করা ছেড়ে দিয়ে অধিকতর জনবান্ধব ও কল্যাণকর সিদ্ধান্ত দেয়া হয়। এরূপ সিদ্ধান্ত দানকে 'মাসলাহার ভিত্তিতে ইস্তিহসান' বলা হয়। যেমন- দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার কারণে পরিবহনের মালিককে, অনুরূপভাবে খাদ্য নষ্ট হওয়ার দায়ে খাদ্য বহনকারীকে জরিমানা করা। এরূপ জরিমানার নির্দেশ সাধারণ নীতির পরিপন্থী। কেননা, চুক্তি অনুযায়ী পরিবহনের মালিক ও খাদ্য বহনকারী আমানতদার হিসেবে গণ্য। সুতরাং তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো সম্পদ নষ্ট না করলে এরূপ ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয়। কিন্তু জনস্বার্থ বিবেচনা করে তাদের ওপর জরিমানা আরোপ করা হয়।

❖ কিয়াসে খাফীর ভিত্তিতে ইস্তিহসান

কোনো কোনো কিয়াসের 'ইল্লাত (কার্যকারণ) স্পষ্ট ও প্রকাশ্য থাকে, আবার কোনো কোনো কিয়াসের 'ইল্লাত স্পষ্ট থাকে না। প্রথম প্রকারের কিয়াসকে *'কিয়াসে জালী'* (প্রকাশ্য কিয়াস) এবং দ্বিতীয় প্রকারের কিয়াসকে *'কিয়াসে খাফী'* (অপ্রকাশ্য কিয়াস) নামে অভিহিত করা হয়। যদি এ দু ধরনের কিয়াসের মধ্যে পারস্পরিক দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তবে প্রকাশ্য কিয়াসের দাবি ছেড়ে অপ্রকাশ্য কিয়াসের দাবি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যদি তা অধিকতর সুবিধাজনক ও উত্তম বিবেচিত হয়। হানাফী মাযহাবে এরূপ ইস্তিহসানের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- হিংস্র পাখির উচ্ছিষ্টের

ব্যাপারে দুটি কিয়াস বিদ্যমান। প্রকাশ্য কিয়াস অনুযায়ী এটি অপবিত্র। কেননা, হিংস্র প্রাণীর গোশত যেহেতু ভক্ষণ করা হারাম, তাই এর উচ্ছিষ্টও অপবিত্র। পক্ষান্তরে অপ্রকাশ্য কিয়াসের দাবি হলো- এর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র নয়। কারণ, হিংস্র প্রাণী দ্বারা উপকার গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নয়, তদুপরি হিংস্র প্রাণী মূলত অপবিত্রও নয়; বরং এ জাতীয় প্রাণীর গোশত ভক্ষণ করা হারাম হওয়ার কারণে তা অপবিত্র বিবেচনা করা হয়। কেননা, এরূপ প্রাণী জিহ্বা দ্বারা পান করে, আর জিহ্বা লালায় সিক্ত থাকে এবং লালা গোশত থেকে নিঃসৃত হয়; কিন্তু পাখির ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য নয়। কারণ, পাখি ঠোঁট দ্বারা পান করে। এ কারণে হানাফীগণ এ ক্ষেত্রে প্রকাশ্য কিয়াসের ওপর অপ্রকাশ্য কিয়াসকে প্রাধান্য দেন।

২. ইস্তিস্‌লাহ

'ইস্তিস্‌লাহ' অর্থ স্বার্থ ও কল্যাণ বিবেচনা। উসূলবিদগণের পরিভাষায় ' ইস্তিস্‌লাহ' বলতে মানুষের এমন সব স্বার্থ বিবেচনাকে বোঝানো হয়, শারী'আত যেগুলোকে কল্যাণকর হিসেবে বিবেচনা করে কোনো বিধানও প্রবর্তন করেনি, আবার এগুলোকে ক্ষতিকর বিবেচনা করে বাতিলও ঘোষণা করেনি; তবে এগুলো বিবেচনা করা হলে শারী'আতের যে কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। উসূলবিদগণ এ জাতীয় স্বার্থকে *'মাসালিহ মুরসালাহ'* নামে অভিহিত করে থাকেন। 'মাসালিহ মুরসালাহ' হলো এমন সব বিষয়, যেগুলো দ্বারা গণমানুষের কল্যাণ সাধনই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে, যেগুলো বাস্তবায়িত করা শারী'আতের উদ্দেশ্যাবলির অন্তর্ভুক্ত এবং যেগুলো মানবজীবনকে সুন্দর ও পরিশীলিতভাবে পরিচালনা করতে প্রয়োজন পড়ে। যেহেতু এসব কাজের মধ্যে কারো একক বা গোষ্ঠীগত কল্যাণ বা স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় না; বরং গণমানুষের কল্যাণ ও স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়, তাই এ কাজগুলোকে *'মাসালিহ মুরসালাহ'* বা গণকল্যাণ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন- মানুষের জানমাল রক্ষা ও চলাচলের সুবিধার্থে মহাসড়কগুলোতে ট্রাফিক সিগন্যাল স্থাপন এবং এ সিগন্যাল অমান্যকারীদের জন্য শাস্তির বিধান প্রবর্তন। উল্লেখ্য যে, এরূপ বিধান প্রবর্তনের পক্ষে-বিপক্ষে যদিও শারী'আতে সুস্পষ্ট কোনো বিধান নেই; কিন্তু তা দ্বারা শারী'আতের গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য 'জানমালের সুরক্ষা'র ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

'ইস্তিসলাহ' ইসলামী শারী'আতের একটি সম্পূরক দলীল। এ দলীল প্রসঙ্গে ইমামগণ নানা দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করলেও প্রত্যেক মাযহাবেই কম-বেশি এর প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[৫] কুর'আন ও হাদীসের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে,

৫. মালিকী ও হাম্বালী মাযহাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণ সাধারণত *'মাসালিহ মুরসালাহ'*কে ইসলামী শারী'আতের একটি দলীল হিসেবে প্রয়োগ করে থাকেন। আর হানাফী ও শাফি'য়ী মতাবলম্বী ইমামগণ যদিও *'মাসালিহ মুরসালাহ'*কে সাধারণভাবে শারী'আতের দলীল হিসেবে স্বীকৃতি

শারী'আতের বিভিন্ন বিধান প্রণয়ের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ রক্ষা ও মানবকল্যাণ সাধন একটি প্রধান উদ্দেশ্য। কাজেই এ কথা সহজেই বোঝা যায়, যে কোনো নতুন বিষয়ের জন্য হুকুম নির্ধারণের ক্ষেত্রে জনস্বার্থ ও কল্যাণের দিকটি বিবেচনায় নেয়া একান্ত আবশ্যক। আমরা সাহাবী ও তাঁদের পরবর্তী সকল মুজতাহিদকে দেখতে পাই যে, তাঁরা ইজতিহাদের ক্ষেত্রে কম-বেশি জনস্বার্থ ও কল্যাণকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছেন। যেমন- খুলাফা রাশিদূনের মধ্যে সাইয়িদুনা আবূ বাকর রা. কর্তৃক কুর'আন সংকলন, সাইয়িদুনা 'উমার রা. কর্তৃক যাকাত ব্যয়ের খাতগুলো থেকে 'মু'আল্লাফাতুল কুলূব'-এর খাত বাদ দেওয়া, খারাজের ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং মৃত্যুশয্যায় তালাক দেওয়া হয়েছে-এমন স্ত্রীকে মীরাছ প্রদানের বিধান প্রবর্তন এবং সাইয়িদুনা 'উসমান রা. কর্তৃক একই পঠনরীতি অনুযায়ী কুর'আন তিলাওয়াত বাধ্যতামূলক করণ প্রভৃতি কাজের পেছনে তাঁদের একান্ত উদ্দেশ্য ছিল জনস্বার্থ রক্ষা, মানবকল্যাণ সাধন ও প্রয়োজন পূরণ। তদুপরি যুগ, কাল, স্থান ও পরিবেশভেদে জনস্বার্থ রক্ষা ও মানবকল্যাণ সাধনের মাধ্যম ও পদ্ধতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। মানুষের ক্রমবর্ধমান অগ্রগতি ও স্বার্থ রক্ষার্থে নিত্যনতুন কৌশল ও পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয়। এরূপ অবস্থায় যদি তাদের সকল স্বার্থ রক্ষা নস্সের মধ্যে সীমিত করে দেয়া হয়, তবে তাদের জীবনের অনেক বিষয়ের সমাধান দেওয়া সম্ভব হবে না। এতে একদিকে মানবতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, অপরদিকে ইসলাম তার গতিশীলতা ও সর্বজনীনতা হারাবে। এসব বিবেচনায় অনেকেই মনে করেন যে, 'ইস্তিসলাহ' শারী'আতের এক অনিবার্য প্রয়োজন।

এ নীতির ভিত্তিতে অনেক সময় ইমামগণ জনস্বার্থ ও কল্যাণ বিবেচনা করে শারী'আতের উদ্দেশ্যাবলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থা ও সময়োপযোগী বহু কল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উসূলুল ফিকহের গ্রন্থসমূহে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা রয়েছে।

বক্ষ্যমাণ বিষয়ে এখানে আলোচনার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হলো, অনেক সময় জনহিতকর বিষয়গুলোর মধ্যেও অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেওয়ার প্রশ্ন চলে আসে। এ ক্ষেত্রে আলিমগণ একটি সাধারণ মূলনীতি প্রণয়ন করেছেন। তা হলো- ব্যক্তিবিশেষ কিংবা গোষ্ঠীবিশেষের নির্দিষ্ট প্রয়োজন ও কল্যাণের চেয়ে গণপ্রয়োজন ও কল্যাণ প্রাধান্য পাবে। তাঁরা এ মূলনীতিটিকে বিভিন্ন ভাষায় ব্যক্ত করে থাকেন। যেমন- المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة (নির্দিষ্ট কল্যাণের ওপর ব্যাপক কল্যাণ অগ্রগণ্য হবে) (Al-Shāṭibī 1997, 3/83) ও الضرر العام يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر

দেওয়া হয়নি; তবুও এ দুটি মাযহাবের অনেক সিদ্ধান্তের মধ্যেই এর নানারূপ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া হানাফী মাযহাবে মাসলাহার ভিত্তিতে ইসতিহসানকে শারী'আতের দলীল হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

(গণক্ষতি অপসারণের জন্য বিশেষ ক্ষতি সহ্য করা হবে) ('Amīmul Ihsān 1986, 139) প্রভৃতি। এ ক্ষেত্রে ইমাম শাতিবী রা. জনস্বার্থ ও প্রয়োজন এবং নির্দিষ্ট স্বার্থ ও প্রয়োজনের মধ্যে অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্য বিচারের জন্য কতিপয় সূক্ষ্ম ফিকহী সূত্র প্রণয়ন করেছেন এবং এগুলো সম্পর্কে তিনি তাঁর *"আল-মুওয়াফাকাত"* গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (Al-Shāṭibī 1997, 2/348-373)। এসব সূত্রের মধ্যে তিনি যে বিষয়ের প্রতি বেশি গুরুত্ব দিতে চেয়েছেন, তাহলো জাগতিক স্বার্থ ও প্রয়োজন এবং পারলৌকিক স্বার্থ ও কল্যাণের মধ্যে তুলনা। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, সাধারণত জাগতিক স্বার্থ ও প্রয়োজনাদির ওপর পারলৌকিক স্বার্থ ও কল্যাণাদি অগ্রগণ্য হবে। তবে তিনি একথাও উলেস্নখ করেছেন, বাস্তবিক পক্ষে জাগতিক স্বার্থ ও প্রয়োজন এবং পারলৌকিক স্বার্থ ও কল্যাণের মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কারণ, ইসলামী শারী'আতের বিধিবিধানর মধ্যে মানুষের সামর্থ্য ও তাদের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়েছে (Al-Shāṭibī 1997, 2/37)।

কতিপয় গবেষক শারী'আতের উদ্দেশ্যাবলির স্তরবিন্যাস (জরুরিয়্যাত[৬], হাজিয়্যাত[৭] ও তাহসীনিয়্যাত[৮]) ও গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য রেখে গণস্বার্থ ও প্রয়োজন এবং নির্দিষ্ট স্বার্থ ও প্রয়োজনের মধ্যে অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্য বিচারের জন্য কতিপয় মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে এ মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হলো-

ক. জরুরিয়্যাতের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কল্যাণ ও স্বার্থের তুলনায় গণকল্যাণ ও স্বার্থ অগ্রগণ্য হবে। সুনির্দিষ্ট স্বার্থটি ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ হোক কিংবা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বার্থ হোক।

৬. 'জরুরিয়্যাত' দ্বারা এমন সব বিষয়কে বোঝানো হয়, যেগুলো দুনিয়া ও আখিরাতে যথার্থ জীবনযাপনের জন্য অত্যাবশ্যক। মানব জীবনে এরূপ অত্যাবশ্যকীয় বিষয় পাঁচটি। ১. দীনের হিফাযাত (حفظ الدين), ২. জীবনের হিফাযাত (حفظ النفس), ৩. আকল বা বিবেকের হিফাযাত (حفظ العقل), ৪. বংশধারার হিফাযাত (حفظ النسل) ও ৫. সম্পদের হিফাযাত (حفظ المال)। এই পাঁচটি বিষয়কে একসাথে 'আল-মাকাসিদ আল-খামসাহ' (المقاصد الخمسة) বলা হয়। এগুলোর নিরাপত্তা বা সংরক্ষণ ছাড়া মানবজীবন কোনোভাবেই সঠিক পথে অগ্রসর হতে পারে না। এ কারণে এসব বিষয়ের হিফাযত ইসলামী শরী'আতের মৌলিক উদ্দেশ্যরূপে পরিগণিত হয়।

৭. 'হাজিয়্যাত' হচ্ছে এমন সকল বিষয়, যেগুলো মানুষের জন্য সাধারণভাবে প্রয়োজনীয় এবং এগুলো বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য হচ্ছে- মানুষের সমস্যা ও কষ্ট দূর করা, কিন্তু এ বিষয়গুলো পাওয়া না গেলে মানুষের জীবনব্যবস্থা ভেঙে পড়ে না, যেমনটি হয় জরুরিয়্যাতের অনুপস্থিতিতে। তবে এতে মানুষ কষ্ট ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়।

৮. 'তাহসীনিয়্যাত' হচ্ছে এমন সকল বিষয়, যেগুলো মানবজীবনকে অধিক সুন্দর, উন্নত ও সাচ্ছন্দ্যময় করে তোলে; তবে তা না হলে মানব সভ্যতা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে না। যেমন- পবিত্রতা অবলম্বন, সুস্বাদু খাবার, সকল কাজে আদাব-কায়দা রক্ষা করে চলা, সুন্দর আচার-ব্যবহার প্রভৃতি।

উল্লেখ্য যে, কল্যাণের নির্দিষ্টতা ও ব্যাপকতা নিরূপণ পাঁচটি মৌলিক জরুরতের মধ্যে যে কোনো একটি জরুরতের বিবেচনায়ও হতে পারে, আবার এ পাঁচটি মৌলিক জরুরতের মধ্যে পরস্পরের বিবেচনায়ও হতে পারে। যেমন- পাঁচটি মৌলিক জরুরতের মধ্যে যেহেতু দুনিয়া ও আখিরাতে মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও সাফল্য দীনের ওপর নির্ভর করে, তাই দীনের সংরক্ষণের জরুরতটি অপর চারটি জরুরতের তুলনায় অধিক ব্যাপক ও প্রয়োজনীয়। এ কারণে অন্য চারটি জরুরতের তুলনায় দীন সংরক্ষণের জরুরতটি অগ্রগণ্য হবে।

খ. হাজিয়্যাতধর্মী নির্দিষ্ট কল্যাণ ও স্বার্থের তুলনায় জরুরীধর্মী গণকল্যাণ ও স্বার্থ অগ্রগণ্য হবে। সুনির্দিষ্ট স্বার্থটি ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ হোক কিংবা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বার্থ হোক।

উল্লেখ্য যে, কল্যাণের নির্দিষ্টতা ও ব্যাপকতা নিরূপণ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বিষয়ের বিবেচনায়ও হতে পারে, আবার এ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে পরস্পরের বিবেচনায়ও হতে পারে।

গ. জরুরীধর্মী নির্দিষ্ট কল্যাণ ও স্বার্থের তুলনায় হাজিয়্যাতধর্মী গণকল্যাণ ও স্বার্থ অগ্রগণ্য হবে, তবে শর্ত হলো, হাজতটি সন্দেহাতীভাবে প্রমাণিত হতে হবে এবং তা এতোই গুরুত্বপূর্ণ হতে হবে যে, যদি তা পূরণ করা না হয়, তাহলে মানুষের ব্যাপক ক্ষতি হবার আশঙ্কা থাকে।

ঘ. হাজিয়্যাতের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কল্যাণ ও স্বার্থের তুলনায় গণকল্যাণ ও স্বার্থ অগ্রগণ্য হবে। সুনির্দিষ্ট স্বার্থটি ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ হোক কিংবা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বার্থ হোক।

উল্লেখ্য যে, কল্যাণের নির্দিষ্টতা ও ব্যাপকতা নিরূপণ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বিষয়ের বিবেচনায়ও হতে পারে, আবার এ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে পরস্পরের বিবেচনায়ও হতে পারে।

ঙ. তাহসীনিয়্যাহধর্মী নির্দিষ্ট কল্যাণ ও স্বার্থের তুলনায় সাধারণভাবে হাজিয়্যাতধর্মী গণকল্যাণ ও স্বার্থ অগ্রগণ্য হবে। সুনির্দিষ্ট স্বার্থটি চাই ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ হোক কিংবা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বার্থ হোক।

চ. তাহসীনিয়্যাহধর্মী নির্দিষ্ট কল্যাণ ও স্বার্থের তুলনায় তাহসীনিয়্যাহধর্মী গণকল্যাণ ও স্বার্থ অগ্রগণ্য হবে। সুনির্দিষ্ট স্বার্থটি ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ হোক কিংবা একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বার্থ হোক।

উল্লেখ্য যে, কল্যাণের নির্দিষ্টতা ও ব্যাপকতা নিরূপণ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে যে কোনো একটি বিষয়ের বিবেচনায়ও হতে পারে, আবার এ পাঁচটি মৌলিক বিষয়ের মধ্যে পরস্পরের বিবেচনায়ও হতে পারে।

ছ. গণস্বার্থ কিংবা অংশবিশেষের কল্যাণ ও স্বার্থের ওপর জরুরীধর্মী নির্দিষ্ট কল্যাণ ও স্বার্থ অগ্রগণ্য হবে, তবে শর্ত হলো, ১. এতে ব্যক্তিবিশেষ একটি অনিবার্য ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে, ২. অপরদিকে এ অগ্রাধিকারের কারণে জনগণের এমন ব্যাপক ক্ষতি কিংবা কঠিন দুর্ভোগে পড়ার আশঙ্কা থাকবে না, যা থেকে অন্য ব্যবস্থায় তাদের উত্তরণ করা সম্ভব নয়।

জ. এ সূত্রগুলো নির্দিষ্ট জনসমষ্টির স্বার্থ ও কল্যাণ (المصلحة البعضية الجزئية) এবং নির্দিষ্ট ব্যক্তির স্বার্থ ও কল্যাণের (المصلحة الخاصة) ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। তবে এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট জনসমষ্টির স্বার্থ ও কল্যাণকে জনস্বার্থ ও কল্যাণের (المصلحة العامة) পর্যায়ভুক্ত বলে গণ্য করতে হবে (Mulhim 2008, 293-294)।

উপর্যুক্ত সূত্রগুলো শারী'আতের উদ্দেশ্যাবলির স্তরবিন্যাস ও গুরুত্বের আলোকে জনস্বার্থ রক্ষাকারী কাজগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্য বিচারের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সহযোগিতা করবে।

৩. সাদ্দুয যারা'ই

'সাদ্দুয যারা'ই'-এর শাব্দিক অর্থ হলো- কোনো অকল্যাণ বা মন্দ কাজের পথ রচনাকারী অনুমোদিত ও বৈধ উপায়-উপকরণগুলো বন্ধকরণ। উসূলবিদগণের পরিভাষায় 'সাদ্দুয যারা'ই' হলো, কাজের এমন সব মাধ্যম রুদ্ধ করা, যা মূলগতভাবে বৈধ ও অনুমোদিত; কিন্তু তা যে কোনো অকল্যাণকর ও নিষিদ্ধ কাজের দিকে ধাবিত করতে পারে। কাজের মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ বিভিন্নরূপ হতে পারে। যেমন-

ক. কাজের যেসব মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ নিশ্চিতভাবে অকল্যাণ ও ক্ষতির দিকে ধাবিত করে। যেমন- (মূর্তিকে গালি দিলে মূর্তিপূজারীরা আল্লাহ তা'আলাকে গালি দেবে-এটা জেনেও) মূর্তিকে গালিগালাজ করা, মানুষের চলাচলের রাস্তায় গর্ত খনন করা।

খ. কাজের যেসব মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ মূলগতভাবে বৈধ; কিন্তু তা দ্বারা যদি কোনো অকল্যাণকর কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্য করা হয়। যেমন- হিল্লা বিয়ে অর্থাৎ তিন তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে তালাক দাতা স্বামীর জন্য হালাল করার উদ্দেশ্য বিয়ে করা।

গ. কাজের যেসব মাধ্যম ও উপায়-উপকরণ মূলগতভাবে বৈধ; কিন্তু তা দ্বারা কোনো অকল্যাণকর কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্য করা হয়নি বটে; কিন্তু অধিকাংশ সময় তা অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে, তদুপরি তাতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণের দিকটিই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। যেমন- কবর সামনে রেখে আল্লাহর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা, ইদ্দত পালন অবস্থায় বিধবার সাজগোছ করা, মদ প্রস্তুতকারীর নিকট আঙ্গুর বিক্রয় করা।

ঘ. কাজের এমন কিছু বৈধ উপায়-উপকরণও রয়েছে, যা কোনো কোনো সময় হয়তো অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে; কিন্তু তাতে অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণের দিকটিই অগ্রাধিকার পেয়ে থাকে। যেমন- বাগদত্তার প্রতি দৃষ্টিদান করা, তাকে ভালোভাবে দেখা, বাকিতে বেচাকেনা করা।

উল্লেখ্য যে, কাজের উপর্যুক্ত মাধ্যম ও উপায়-উপকরণসমূহের মধ্যে প্রথম প্রকারের মাধ্যম ও উপায়-উপকরণগুলো অবলম্বন করা গর্হিত হওয়ার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই। এগুলো অবশ্যই মন্দ ও নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে চতুর্থ প্রকারের উপায়-উপকরণ অবলম্বন বৈধ হবার ব্যাপারেও কারো কোনো দ্বিমত নেই। এগুলো ক্ষেত্রবিশেষে কাম্য ও প্রয়োজনীয়ও। বস্তুতপক্ষে আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনার বিষয়বস্তু হলো দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকারের উপায়-উপকরণগুলো। এ ব্যাপারে অধিকাংশ ইমামের কথা হলো, 'সাদ্দুয যারা'ই' ইসলামী আইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পূরক দলীল। ক্ষতি ও অকল্যাণের পথ রুদ্ধ করার স্বার্থে এরূপ বৈধ উপায়-উপকরণ গুলোর চর্চা রুদ্ধ করা প্রয়োজন (Ibn al-Qayyim 1968, 3/136)। কুর'আন ও হাদীসে এ নীতির ওপর ভিত্তি করে বহু বিধান প্রণীত হয়েছে এবং সাহাবীগণও এ নীতির ওপর ভিত্তি করে বহু সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তবে সাদ্দুয যারা'ই ইসলামী আইনের একটি দলীল হওয়ার অর্থ এই নয় যে, যে কোনো ক্ষেত্রে একে সাধারণভাবে প্রয়োগ করা যাবে। কেননা, কাজের মাধ্যম বা উপায়-উপকরণ সকল ক্ষেত্রে একই রূপ ভূমিকা রাখে না। কোনো ক্ষেত্রে হয়তো এর ভূমিকা অকাট্য ও শক্তিশালী, আবার হয়তো কোনো ক্ষেত্রে এর ভূমিকা অত্যন্ত দুর্বল। যেমন ধরুন, আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি হয় বিধায় আঙ্গুর চাষ নিষিদ্ধ করার যুক্তি খুবই দুর্বল; পক্ষান্তরে যারা আঙ্গুর থেকে মদ তৈরি করে তাদের কাছে আঙ্গুর বিক্রয় করার যুক্তি অত্যন্ত শক্তিশালী। তদুপরি এ নীতি অধিকমাত্রায় প্রয়োগ করা হলে মানুষের জীবনযাত্রা কষ্টকর ও দুঃসহ হয়ে ওঠতে পারে। আবার প্রয়োজনের সময় এ নীতি প্রয়োগের ব্যাপারে শিথিলতা প্রদর্শন করা হলে মানুষ অনেক ক্ষেত্রে অকল্যাণের দিকে ধাবিত হতে পারে। এ কারণে উসূলবিদগণ এ নীতি প্রয়োগের জন্য কতিপয় শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন।

১. যদি বৈধ ও অনুমোদিত কোনো উপায়-উপকরণ সরাসরি অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে। অকল্যাণের প্রতি ধাবিত করাটা ইচ্ছাকৃত ভাবে হোক কিংবা অনিচ্ছাকৃত ভাবে। এমনকি ভালো নিয়্যাতেও যদি উক্ত উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা হয় এবং তা অকল্যাণ ও ক্ষতির দিকে নিয়ে যায়, তবে তা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হবে।

২. যদি কোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বন কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝামাঝি অবস্থান করে, তবে সে ক্ষেত্রে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি থাকলে এ নীতি গ্রহণ করা হবে।

৩. যদি উপায়-উপকরণ অকাট্যভাবে অথবা অধিকাংশ ক্ষেত্রে অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে, তাহলেও এ নীতি গ্রহণ করা হবে। পক্ষান্তরে যা কদাচিৎ কিংবা কোনো কোনো সময় অকল্যাণ সাধন করে, তা নিষিদ্ধ হবে না।

৪. যদি উপায়-উপকরণ প্রবল ধারণার ভিত্তিতে অকল্যাণের দিকে ধাবিত করে, তবে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পরিমাণ বিবেচনায় তা নিষিদ্ধ হবে।

৫. সাদ্দুয যারা'ই কোনোক্রমেই শারী'আতের কোনো নস্‌সের পরিপন্থী হবে না (Ruhul Amin 2013, 189-190)।

১৯৯৫ সালের ১-৬ এপ্রিলে সংযুক্ত আরব আমিরাতের আবুধাবীতে অনুষ্ঠিত (ওআইসি-এর অন্তর্গত) مجمع الفقه الإسلامي (ফিক্‌হ একাডেমি)-এর নবম সম্মেলনে 'সাদ্দুয যারা'ই প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তগুলো গৃহীত হয় :

১. সাদ্দুয যারা'ই ইসলামী শারী'আতের একটি দলীল। এর প্রকৃত মর্ম হলো- এমন প্রত্যেক বৈধ ও অনুমোদিত কাজ বন্ধ করা, যা কোনো অকল্যাণ বা নিষিদ্ধ কাজের পথ রচনা করে।

২. কেবল সন্দেহ বা সতকর্তার ওপর ভিত্তি করে সাদ্দুয যারা'ই নীতি প্রয়োগ করা যাবে না; বরং এ নীতি কেবল সে কাজের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা যাবে, যে কাজের প্রকৃতি এমনই যে, তা সচরাচর নিষিদ্ধ কাজের পথ রচনা করে থাকে।

৩. সাদ্দুয যারা'ই-এর দাবি হলো, কোনো নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হবার জন্য অথবা কোনো শার'য়ী দায়িত্ব থেকে বাঁচার জন্য হীলা (কৌশল) অবলম্বন করা সমীচীন নয়। উল্লেখ্য যে, হীলা ও যারী'আহ এক নয়; এ দুটির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। হীলার মধ্যে কাজটি উদ্দেশ্যগতভাবেই হয়ে থাকে; কিন্তু যারী'আর মধ্যে কাজটি উদ্দেশ্যগতভাবে পাওয়া যাওয়া শর্ত নয় (Al-Zuhaylī 1985, 7/206)।

৪. ই'তিবারুল মা'লাত (اعتبار المآلات)

এ নীতির ভিত্তিতেও ক্ষেত্রবিশেষে ইমামগণ কাজের পরিণতি ও ফলাফল বিবেচনা করে বহু বিধিবদ্ধ কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, আবার বহু নিষিদ্ধ কাজ

ক্ষেত্রেবিশেষে অনুমোদন করেছেন। নিম্নে সংক্ষেপে এ নীতির পরিচয়, গুরুত্বও প্রয়োগের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হলো-

'ই'তিবারুল মা'লাত'-এর শাব্দিক অর্থ পরিণতি বিবেচনা করা। ইসলামী আইনের পরিভাষায় 'ই'তিবারুল মা'লাত' বলতে বোঝানো হয়, কাজের সম্ভাব্য ফলাফল ও পরিণতির কথা বিবেচনা করে আগেভাগে তা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দান করা। ড. ওয়ালীদ ইবনুল হুসাইন বলেন, المراد باعتبار المآل: الحكم على مقدمات التصرفات بالنظر إلى نتائجها. -''ই'তিবারুল মা'ল'' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- কাজের ফলাফল দেখে কাজের প্রাথমিক অনুষঙ্গসমূহের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেওয়া" (Al-Walīd 2009, 19)।

'ই'তিবারুল মা'লাত' ইসলামী শারী'আতের একটি মূলনীতি এবং শারী'আতের অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে স্বীকৃত। বিভিন্ন মাযহাবের মধ্যে এর অনুশীলন দেখা যায়, বিশেষ করে মালিকী মাযহাবের মধ্যে এ নীতিটি খুবই প্রসিদ্ধ। ইমাম শাতিবী রহ. বলেন,

> কাজের পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখা শারী'আতের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য এবং উদ্দিষ্ট। চাই কাজগুলো উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হোক কিংবা পরিপন্থী। এর ব্যাখ্যা হলো, মুজতাহিদ কোনো কাজের ব্যাপারে তার ফলাফল না দেখে ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক কোনোরূপ সিদ্ধান্ত দেবে না। কারণ, কখনো কোনো কাজ কোনো কল্যাণ সাধন কিংবা কোনো ক্ষতি দূরীভূতকরণের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ করা হয়; কিন্তু বাস্তবে কখনো এর ফলাফল বিপরীত দাঁড়ায়। অনুরূপভাবে সম্ভাব্য ক্ষতি কিংবা কোনো কল্যাণ ছুটে যাওয়ার আশঙ্কায় কোনো কাজ নিষিদ্ধ করা হয়; কিন্তু বাস্তবে কখনো এর ফলাফল বিপরীত দাঁড়ায়। এ জন্য প্রথম অবস্থায় যদি সাধারণভাবে কাজটিকে বিধিবদ্ধ বলা হয়, তাহলে অনেক সময় এতে কল্যাণ সাধিত হওয়ার পরিবর্তে অকল্যাণই সাধিত হতে পারে। আর এ অকল্যাণ কখনো কল্যাণের সমান মাত্রায়ও হতে পারে, আবার কখনো এর অকল্যাণের মাত্রা বেড়েও যেতে পারে। এ কারণে এ জাতীয় কাজকে সাধারণভাবে বিধিবদ্ধ বলা অনুচিত। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় অবস্থায় যদি সাধারণভাবে কাজটিকে নিষিদ্ধ বলা হয়, তাহলে অনেক সময় এতে একটি ক্ষতি দূরীভূত করতে গিয়ে আর একটি এমন ক্ষতি টেনে আনা হতে পারে, যা কখনো ঐ ক্ষতির সমানও হতে পারে, কিংবা এর চেয়ে এর ক্ষতির মাত্রা আরো বাড়তে পারে। এ কারণে এ জাতীয় কাজকে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ বলা অনুচিত। বস্তুতপক্ষে এটাই হলো মুজতাহিদের জন্য দুর্গম ক্ষেত্র। তবে তা অবশ্যই উপকারী ও পরিণতির দিকে প্রশংসিত এবং শরী'আতের উদ্দেশ্যাবলির সাথে সঙ্গতিপূণ (Al-Shāṭibī 1997, 5/177)।

শরী'আতের কাজগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্য বিচারের ক্ষেত্রে 'কাজের ফলাফল ও পরিণতির দিকে দৃষ্টিদান' একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, তা

শারী'আতের উদ্দেশাবলি অত্যন্ত সফলভাবে কার্যকর করতে ভূমিকা রাখে। তদুপরি, একজন মুফতী যদি কাজের পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখেন, তাহলেই তিনি সমাজ ও ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট কাজটি শরী'আতের উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে সম্পাদনের জন্য দিকনির্দেশনা দিতে পারেন। তদুপরি বিভিন্ন কাজের মধ্যে অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্য বিচারের ক্ষেত্রে এর সুস্পষ্ট প্রভাব হলো- কোনো মুফতী যদি বর্তমান অবস্থাকে কোনো হুকুমের জন্য উপযোগী মনে করেন; কিন্তু পরিণতির দিকে তাকিয়ে তিনি এর বিপরীত ফাতওয়া দিতে পারেন। তাঁর এ সিদ্ধান্ত হবে জনকল্যাণ ও শরী'আতের উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের নিমিত্ত বর্তমানের ওপর ভবিষ্যতের অবস্থাকে প্রাধান্য দেওয়ার নামান্তর।

কোনো কোনো গবেষক পরিণতি বিবেচনার ওপর ভিত্তি করে অগ্রগণ্যতা বিচারের জন্য কয়েকটি পদ্ধতির কথা উলেস্নখ করেছেন। নিম্নে এরূপ দুটি পদ্ধতির কথা আলোচনা করা হলো-

ক. সতকর্তার দাবি অনুসারে অগ্রগণ্যতা বিচার

দুটি বিধানের মধ্যে যাতে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে, সেটি অন্য বিধানের ওপর প্রাধান্য পাবে। উল্লেখ্য যে, এখানে সতর্কতা বলতে কেবল কঠোরতা আরোপকে বোঝানো হয়নি, যা সাধারণত লোকেরা বোঝে থাকে। বরং সতর্কতা কখনো সহজতার দিক থেকেও হতে পারে, যাতে লোকেরা বিধানটি স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে পালন করতে সমর্থ হয়। কারণ, অনেক সময় ক্ষেত্রবিশেষে কঠোরতার কারণে সংশ্লিষ্ট বিধানটি পরিত্যক্ত ও অবহেলিত হয়ে পড়ে। আবার কখনো সতর্কতামূলক কঠোরতা আরোপ সুন্নাতের বিরোধিতার উপলক্ষেও পরিণত হতে পারে। এ কারণে ইমাম ইবনু হাযম আয-যাহিরী [৩৮৪-৪৫৬ হি.] রহ. বলেন,

> وكل احتياط أدى إلى الزيادة في الدين ما لم يأذن به الله تعالى، أو إلى النقص منه، أو إلى تبديل شيء منه فليس احتياطا، ولا هو خيرا، بل هو هلكة وضلال وشرع لم يأذن به الله تعالى؛ والاحتياط كله لزوم القرآن والسنة.
>
> প্রত্যেক সতর্কতা, যা দীনের মধ্যে এমন কোনো সংযোজন বা বিয়োজন বা পরিবর্তনের দিকে নিয়ে যায়, যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোনো অনুমোদন নেই, তাহলে সেটা সতর্কতা নয়; বরং সেটা ধ্বংস, ভ্রষ্টতা ও নতুন শারী'আত প্রবর্তনের নামান্তর। প্রকৃতপক্ষে সর্বার্থেই সতর্কতা হলো- কুর'আন ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা (Ibn Hazm 1404H, 5/8)।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ [৬৬১-৭২৮ হি.] রহ. বলেন,

> والاحتياط حسن ما لم يفض بصاحبه إلى مخالفة، فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك هذا الاحتياط.

সতর্কতা অবলম্বন ভালো, যে যাবত না তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সুন্নাতের বিরোধিতার দিকে নিয়ে যায়। যদি তা কোনোভাবে সুন্নাতের বিরোধিতার দিকে নিয়ে যায়, তাহলে সতর্কতা হলো, এরূপ সতর্কতা ত্যাগ করা (Ibn al- Qayyim 1971, 1/163)।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন,

وينبغي أن يعلم أن الاحتياط الذي ينفع صاحبه ويثيبه الله عليه : الاحتياط في موافقة السنة وترك مخالفتها، فالاحتياط كل الاحتياط في ذلك؛ وإلا فما احتاط لنفسه من خرج عن السنة، بل ترك حقيقة الاحتياط في ذلك.

জেনে রাখা উচিত, যে সতর্কতা ব্যক্তির উপকারে আসবে এবং যে কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন, তা হলো কুর'আন ও সুন্নাতের অনুসরণ এবং এতদুভয়ের বিরোধিতা পরিত্যাগ করার ক্ষেত্রে সতর্কতা। সবধরনের সতর্কতা এ কাজেই নিয়োজিত হতে হবে। পক্ষান্তরে সুন্নাত থেকে বের হয়ে যে ব্যক্তি নিজের স্বার্থে সতর্কতা অবলম্বন করলো, সে প্রকৃতপক্ষে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সতর্কতাকেই পরিহার করলো (Ibn al-Qayyim 1971, 1/162)।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, নস্‌সের দাবি অনুসারে আমল ছেড়ে এমন কোনো কাজ করা অনুচিত, যার পরিণতি সুখকর নয়, যদিও তা সতর্কতার নামে হোক, কিংবা পরহেযগারির নামে হোক। এসব ক্ষেত্রে প্রকৃত সতর্কতা হলো, ঐ সতর্কতা ছেড়ে দেওয়া।

সকতর্কতার দাবি অনুসারে অগ্রগণ্য বিধানের একটি উদাহরণ হলো- কারো তাওয়াফ করার সময় যদি সন্দেহ হয় যে, সে কি সাতবার চক্কর দিলো, নাকি ছয়বার চক্কর দিলো। এরূপ অবস্থায় সে সতর্কতামূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। যে কয়টি চক্করের ব্যাপারে সে নিশ্চিত, তার ওপর ভিত্তি করে সে আরো একটি চক্কর বাড়াতে পারে। এ সিদ্ধান্তের পেছনে তার উদ্দেশ্য থাকবে, যাতে তার এ 'আমল সুন্নাত অনুসারে সুচারুরূপে আদায় হয়। কেননা, নিশ্চিত চক্করগুলোর ওপর ভিত্তি করে যদি সে অন্য একটি চক্কর বৃদ্ধি না করে, তাহলে হতে পারে যে, তার এ 'ইবাদাতটি অপূর্ণ থেকে যাবে এবং এ অবস্থায় তার হজ্জটিও নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বলা বাহুল্য, যে কোনো ব্যক্তি এভাবে তার হজ্জ নষ্ট হয়ে যাওয়ার চেয়ে এমন একটি চক্কর দেয়াকে অনেক সহজ মনে করবে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে তার সতর্কতা অবলম্বন তার প্রতি অধিক দয়া প্রদর্শনের নামান্তর।

খ. সহজীকরণের দাবি অনুসারে অগ্রগণ্যতা বিচার

যদি কোনো বিষয়ে পরস্পর বিরোধী দুটি বিধানের মধ্যে একটি বিধান সহজ ও অপর বিধানটি কঠিন হয়, তবে এ দুটি বিধানের মধ্যে কোন্ বিধানটিকে অগ্রগণ্যরূপে

সাব্যস্ত করা হবে? এ ব্যাপারে উসূলবিদগণের বিভিন্ন মত দেখা যায়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এ প্রসঙ্গে সাতটি মত উলেস্নখ করেছেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ মতগুলো হলো- ১. অপেক্ষাকৃত কঠিন বিধানকেই গ্রহণ করতে হবে। ২. অপেক্ষাকৃত সহজ বিধানকেই গ্রহণ করতে হবে। ৩. এক্ষেত্রে লোকেরা নির্ভরযোগ্য বিজ্ঞতম ও পরহেযগার 'আলিমের শরণাপন্ন হবে এবং তারা তাঁর ফাতওয়া অনুযায়ী 'আমল করবে। ৪. এক্ষেত্রে লোকেরা ইচ্ছে অনুযায়ী যে কোনো মত গ্রহণ করতে পারবে (Ibnul Qayyim 1968, 4/2-3; Ibnus Salāh 1407H, 164-165)।

উল্লেখ্য যে, অপেক্ষাকৃত সহজ বিধানটিকেই অগ্রগণ্য সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে 'কাজের পরিণতি বিবেচনা' একটি বড় ফ্যাক্টর। কেননা, এতে একদিকে সংশ্লিষ্ট কাজটি আদায় করা লোকদের জন্য সহজ হয়, অপরদিকে এই আমলের কারণে মানুষ কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে। এর একটি উদাহরণ হলো- ওযু ব্যতীত তাওয়াফ করা। জুমহুরের মতে, তাওয়াফের জন্য ওযু শর্ত। কাজেই ওযু ব্যতীত তাওয়াফ করা জায়িয নয়। পক্ষান্তরে কারো কারো মতে- তাওয়াফের জন্য ওযু শর্ত নয়।[৯] এখন অবস্থা যদি এমনটি দাঁড়ায় যে, তাওয়াফ শুরু করার পর কারো ওযু ভেঙ্গে গেলো, অপরদিকে মাতাফের মধ্যে কিংবা ওযু খানার মধ্যে প্রচণ্ড ভীড় লেগে রইলো এবং লোকটিও এমন বয়োজ্যেষ্ঠ কিংবা অসুস্থ, যার পক্ষে মাতাফ কিংবা ওযুখানার ভীড় ভেঙ্গে ওযু করা এবং এরপর ফিরে এসে তাওয়াফ করা অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এরূপ ব্যক্তির জন্য ইমামগণের মধ্যকার মতপার্থক্যের সুযোগ নিয়ে মুফতী যদি ফাতওয়া দেন যে, এ ধরনের অবস্থায় ওযু ব্যতীত তাওয়াফ করা জায়িয; তবে তা অবশ্যই উত্তম সিদ্ধান্ত হবে। পক্ষান্তরে যদি ভীড় না থাকে এবং ওযু করতে কষ্টও না হয়, তাহলে ইমামগণের মতপার্থক্য থেকে বেঁচে থাকার নিমিত্তে ফাতওয়া দেবেন যে, ওযু ছাড়া তাওয়াফ জায়িয হবে না। এ উদাহরণ থেকে জানা যায় যে, সহজ বিধানটি গ্রহণ করার ক্ষেত্রে 'কাজের অবস্থা ও পরিণতি বিবেচনা' একটি বিরাট অনুষঙ্গ।

৫. একান্ত প্রয়োজনে দুর্বল মতানুসারে ফাতওয়া দান

এখানে দুর্বল মত দ্বারা উদ্দেশ্য, যে মতের দলীল দুর্বল। সাধারণত দুর্বল মত বলতে অগ্রগণ্য মতের বিপরীত মতকে বোঝানো হয়, আবার কখনো প্রসিদ্ধ মতের বিপরীত মতকেও বোঝানো হয়ে থাকে।

দুর্বল মতকে দু প্রকারে ভাগ করা যায়। এক. আপেক্ষিক দুর্বল মত অর্থাৎ যে মতটি তার চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী মতের পরিপন্থী। এ ধরনের মত তার চেয়ে

৯. অধিকাংশ হানাফীই এ মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে, তাওয়াফের জন্য ওযু শর্ত নয়; সুন্নাত। কাজেই কোনো ব্যক্তি যদি ওযু ছাড়াও তাওয়াফ করে, তবে তার তাওয়াফ সহীহ হবে।

শক্তিশালী মতের তুলনায় দুর্বল হলেও তার নিজস্ব কিছু শক্তি ও বৈশিষ্ট্য থাকে। দুই. প্রকৃত দুর্বল মত অর্থাৎ যে মতটি কুর'আন-হাদীসের কোনো বক্তব্য কিংবা ইজমা' অথবা কিয়াসে জলী বা ইসলামের সামগ্রিক নীতিমালার পরিপন্থী। এরূপ মতের গ্রহণযোগ্য নিজস্ব কোনো শক্তি বা বৈশিষ্ট্য নেই। তাই এরূপ মত সর্বার্থেই পরিত্যাজ্য।

ফকীহদের সর্বস্বীকৃত একটি নীতি হলো- শক্তিশালী ও নির্ভরযোগ্য মতকে প্রাধান্য দেওয়া এবং সে অনুসারে ফাতওয়া দেওয়া এবং সাধারণ অবস্থায় কোনো বিরল কিংবা দুর্বল মত গ্রহণ না করা। ইমাম আবূ 'আবদিলস্নাহ মুহাম্মাদ আল-মাযিরী [৪৫৩-৫৩৬ হি.] রহ. বলেন,

> ولا أفتي بغير المشهور، ولست ممن يحمل الناس على غير المعروف المشهور من مذهب مالك وأصحابه؛ لأن الورع قل، بل كاد يعدم، والتحفظ على الديانات كذلك، وكثرت الشهوات، وكثر من يدعي العلم ويتجاسر على الفتوى فيه، فلو فتح لهم باب فى مخالفة المذهب؛ لاتسع الخرق على الراقع، وهتكوا حجاب هيبة المذهب، وهذا من المفسدات التى لا خفاء بها
>
> আমি প্রসিদ্ধ মত ছেড়ে অন্য কোনো মতানুসারে ফাতওয়া দিই না এবং লোকদেরকে অন্য কোনো মত গ্রহণ করার জন্যও উদ্বুদ্ধ করি না। কারণ, পরহেযগারি হ্রাস পেয়েছে; বরং প্রায় নিঃশেষই হয়ে গেছে। আর ধর্মপরায়ণতা রক্ষার কাজ এ পদ্ধতিতেই হতে পারে। তদুপরি মানুষের লালসা অনেক বেড়ে গেছে এবং 'ইলমের দাবিদার ও গভীর জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেচনা ছাড়া ফাতওয়া দেওয়ার মতো লোকও অনেকে বৃদ্ধি পেয়েছে। এরূপ অবস্থায় যদি মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতের বিরোধিতা করার কোনো দরজা খোলে দেয়া হয়, তাহলে তালি দাতার জন্য ফাঁটল দিন দিন বাড়তে থাকবে এবং তারা মাযহাবের ভয়ের পর্দা ছিঁড়ে ফেলবে। এটা নিঃসন্দেহে একটা প্রকাশ্য বিপর্যয় (Al-Shāṭibī 1997, 5/101)।

এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট হানাফী ফকীহ ইবনু 'আবিদীন [১২৪৪-১৩০৬ হি.] রহ. বলেন,

> إن الواجب على من أراد أن يعمل نفسه، أو يفتي غيره أن يتبع القول الذي رجحه علماء مذهبه' فلا يجوز له العمل أو ألإفتاء بالمرجوح إلا في بعض المواضع.
>
> যে ব্যক্তি নিজে কোনো 'আমল করতে চায় কিংবা অপরকে ফাতওয়া দিতে চায়, তার জন্য উচিত হলো, সে মাযহাবের 'আলিমগণ কর্তৃক অগ্রগণ্য সাব্যস্ত মতকেই অনুসরণ করে চলবে। তার জন্য দুর্বল মতানুযায়ী 'আমল করা কিংবা ফাতওয়া দেওয়া জায়িয হবে না। তবে কিছু ক্ষেত্র ব্যতীত (Ibnu 'Ābidīn 1980, 1)।

তবে কতিপয় ফকীহ বিভিন্ন শর্তসাপেক্ষে ক্ষেত্রবিশেষে দুর্বল মতানুযায়ী ফাতওয়া দেবার পক্ষে মত ব্যক্ত করেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁদের উদ্দেশ্য অবশ্যই নিজের স্বার্থ

কিংবা লালসা পূরণ অথবা নিজের পাণ্ডিত্য প্রদর্শন নয়; বরং তাঁদের একান্ত উদ্দেশ্য থাকে- সমস্যাপীড়িত ব্যক্তির জন্য 'আমল সহজ করা এবং তাকে দুর্দশা থেকে মুক্ত করা। এ লক্ষ্যে তাঁরা অনেক সময় ইমামগণের মতবিরোধেরও সুযোগ নিয়ে থাকেন।

অনেক সময় কঠিন অবস্থা থেকে মুক্তি লাভ এবং সাচ্ছন্দ্যের সাথে শারী'আতের ওপর আমল সহজ করার উদ্দেশ্যেও মাযহাবের দুর্বল মতগুলো তালাশ করা হয়ে থাকে। এভাবে কখনো এ দুর্বল মতগুলোই নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে এবং এগুলোকে ঘিরেই ফিকহ চর্চা ও ফাতওয়ার কার্যক্রম চলতে থাকে। ফলে দেখা যায়, একসময় যে মতগুলো দুর্বলরূপে বিবেচিত হতো, সেগুলোই যুগের বিবর্তনে সমাজে চালু হয়ে যায় এবং যে মতগুলো একসময় প্রসিদ্ধ ছিল, পরবর্তীতে এ প্রসিদ্ধি কোনো কাজে আসেনি। এমনকি ইমাম আবূ ইউসূফ ও ইমাম মুহাম্মাদ রা.-এর যুগে যে মতগুলো বিরল ছিল, পরে জনস্বার্থ ও প্রয়োজনের কারণে সে মতগুলোই মানুষের কাছে সমাদর পেতে থাকে (Jaddī ND, 14-15)।

বিশিষ্ট ফকীহ আল-হাজাভী আস-সা'আলাবী [১২৯১-১৩৭৬ হি.] রহ. বলেন,

> فإذا كان العمل بالضعيف لدرء مفسدة فهو على أصل مالك في سد الذرائع، أو جلب مصلحة، فهو على أصله في المصالح المرسلة.. فإذا زال الموجب عاد الحكم للمشهور لأن الحكم بالراجح ثم المشهور واجب.
>
> যদি দুর্বল মতানুযায়ী 'আমল কোনো ক্ষতি দূরীভূত করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে তা হবে ইমাম মালিক রা.-এর অনুসৃত মূলনীতি 'সাদ্দুয যারা'ই'-এর অনুসরণ। আর যদি দুর্বল মতানুযায়ী 'আমল কোনো গণকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তবে তা হবে ইমাম মালিক রহ.-এর অনুসৃত মূলনীতি 'মাসালিহ মুরসালাহ'-এর অনুসরণ। ..যদি এরূপ কোনো উপলক্ষ না থাকে, তবে মাযহাবের প্রসিদ্ধ মতানুসারেই আমল করতে হবে এবং ফাতওয়া দিতে হবে। কেননা, অগ্রগণ্য, অতঃপর প্রসিদ্ধ মতানুসারেই সিদ্ধান্ত দেওয়া ওয়াজিব ('ajawī 1340H, 465)।

যাঁরাই দুর্বল মতানুসারে ফাতওয়া দেবার কথা বলেছেন, তাঁরা এজন্য চারটি শর্তারোপ করেছেন।

ক. মতটি অতিরিক্ত দুর্বল হবে না;

খ. মতটি কার, তা জানা থাকতে হবে;

গ. মতটি প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কারো কল্যাণ সাধন কিংবা কারো থেকে কোনো ক্ষতি দূরীভূতকরণের ব্যাপারটি সুনিশ্চিত হতে হবে;

ঘ. ফাতওয়াটি কোনো নির্ভরযোগ্য মুজতাহিদ থেকে প্রকাশিত হতে হবে (Ibn ‘Ābidīn 1980, 48; Al-Shanqītī 1988, 2/272; Riyād 1423H, 546)।

ইবনু ‘আবিদীন রহ. এ ব্যাপারে বলেছেন, أن يكون العمل بالضعيف في بعض الأوقات لضرورة- ‘‘দুর্বল মতানুসারে ‘আমল কোনো কোনো সময়ে নিতান্ত প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে হতে পারে’’ (Ibn ‘Ābidīn 1980, 49)। তাঁর এ কথাটিও একটি শর্ত হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে।

দুর্বল মতানুযায়ী ফাতওয়ার একটি উদাহরণ হলো- যদি মুফতী মনে করেন যে, তাওয়াফের আগে সা‘ঈ করা জায়িয নয়। এখন এক ব্যক্তি তাওয়াফের আগে সা‘ঈ শেষ করে এসে তাঁর কাছে ফাতওয়া চাইলো, আর সময়টি হলো ভীষণ ভীড় ও কষ্টের। এরূপ অবস্থায় মুফতী যদি জানতে পারেন যে, ইমামগণের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ মতও পোষণ করেছেন (Al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah 1995, 25/15)[১০], তবে মুফতী নিজে এ মতকে দুর্বলরূপে জানেন, তাহলে তিনি এ দুর্বল মতানুসারে ফাতওয়া দিতে পারেন।

৬. তারজীহের[১১] নীতিমালা অনুসরণ

শারী‘আতের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্য বিচারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো- তারজীহের নীতিমালা সম্পর্কে মুজতাহিদের পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে। বলতে গেলে এ অগ্রগণ্যতা ও প্রাধান্য বিচার অনেকাংশে এ শর্তের ওপর নিভরশীল। বিভিন্ন সমমর্যাদা সম্পন্ন কিংবা কাছাকাছি বিষয়সমূহে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দিতে এ নীতিগুলো একজন মুজতাহিদ ও ফিকহগবেষককে প্রভূত সাহায্য করতে পারে। উসূলুল ফিকহের গ্রন্থসমূহে এসব নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত

১০. ইমাম আওযা‘য়ী রহ. এরূপ মত পোষণ করেন। বিশিষ্ট তাবি‘য়ী ‘আতা রা. থেকেও এরূপ মত বর্ণিত আছে। ইমাম আহমাদ রহ. থেকেও এরূপ একটি রিওয়ায়াত বর্ণিত আছে যে, কেউ যদি ভুলক্রমে তাওয়াফের আগে সা‘ঈ করে, তবে তার এ সা‘ঈ তার জন্য যথেষ্ট হবে। (*আল-মাওসূ‘আতুল ফিকহিয়্যাহ*,কুয়েত: ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫, খ. ২৫, পৃ. ১৫ [প্রবন্ধ: সা‘ঈ])

১১. *‘তারজীহ’* শব্দের অর্থ অগ্রাধিকার দান এবং *‘আউলাভিয়্যাত’*-এর অর্থও অগ্রাধিকার। তবে এ দুটি শব্দের ব্যবহারের মধ্যে সামান্য পার্থক্য আছে। *‘তারজীহ’* শব্দটি যেমন পারস্পরিক বিপরীত দুটি দলীলের মধ্যে অগ্রাধিকার দেয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়, তেমনি পারস্পরিক বিপরীত নয়-এরূপ দুটি রীতিসিদ্ধ কাজের মধ্যে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। পক্ষান্তরে *‘আউলাভিয়্যাত’* কেবল পারস্পরিক বিপরীত নয়-এরূপ দুটি রীতিসিদ্ধ কাজের মধ্যে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয়। এ দিক থেকে বলা যায় যে, *‘তারজীহ’* শব্দটি *‘আউলাভিয়্যাত’*-এর চেয়ে অধিকতর ব্যাপকতাজ্ঞাপক।

আলোচনা রয়েছে। আমরা এখানে কেবল *‘ফিকহ আউলাভিয়্যাত’*-এর সাথে সংশ্লিষ্ট তারজীহের কতিপয় মূলনীতি তোলে ধরবো। এ মূলনীতিগুলোকে প্রকৃতি অনুযায়ী প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যেমন-

ক. বিধিবিধানের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে কাজের অগ্রাধিকার;

খ. লাভ-ক্ষতির তারতম্য অনুসারে কাজের অগ্রাধিকার;

গ. হকদারদের মর্যাদা অনুসারে কাজের অগ্রাধিকার।

ক. বিধিবিধানের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে কাজের অগ্রাধিকার

বিধিবিধানের গুরুত্ব ও মর্যাদা অনুসারে কাজের অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য ইমামগণ বিভিন্ন নীতি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও মানদণ্ডগুলো হলো-

ক. ১. ফরয ‘আইন ফরযে কিফায়ার তুলনায় অগ্রগণ্য

যদি একই সময় কারো ওপর দুটি কর্তব্য আপতিত হয় এবং তন্মধ্যে একটি ফরযে ‘আইন ও অপরটি ফরযে কিফায়াহ, আর তার পক্ষে একসাথে দুটি কর্তব্য পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে তাকে ফরযে কিফায়াহটি ছেড়ে ফরযে ‘আইনটি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সম্পাদন করতে হবে। যেমন- জিহাদ ও পিতামাতার সেবা। তন্মধ্যে জিহাদ (রাষ্ট্রের দায়িত্বে পরিচালিত যুদ্ধ অর্থে) ফরযে কিফায়াহ এবং পিতামাতার সেবা ফরযে ‘আইন, যদি তাদের সেবা করার জন্য অপর কেউ না থাকে। যদি এ দুটি কর্তব্য এক সাথে কারো ওপর আপতিত হয় এবং তার পক্ষে এ দুটি কর্তব্য একসাথে পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে জিহাদ ছেড়ে দিয়ে পিতামাতার সেবা করবে।

ক. ২. বিলম্বে আদায় করা সমীচীন নয়-এরূপ কর্তব্য বিলম্বে আদায়যোগ্য কর্তব্যের তুলনায় অগ্রগণ্য

যেমন- পিতামাতার সেবা ও হজ্জ। এ দুটি কর্তব্যের মধ্যে পিতামাতার সেবা দেরিতে করার সুযোগ নেই, যদি তাদের সেবা করার জন্য অপর কেউ না থাকে, আর (অনেক ইমামের মতে) হজ্জ বিলম্বে আদায় করার সুযোগ রয়েছে। যদি এ দুটি কর্তব্য একসাথে কারো ওপর আপতিত হয় এবং তার পক্ষে এ দুটি কর্তব্য একসাথে পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে আপাত হজ্জ সম্পাদন ছেড়ে দিয়ে পিতামাতার সেবা করবে।

ক. ৩. সুন্নাত ও নফলের তুলনায় ফরয ও ওয়াজিব অগ্রগণ্য

যেমন- ফরয সালাত এবং সুন্নাত ও নফল সালাত। এ দু ধরনের ‘ইবাদাতের মধ্যে যদি অনিবার্য কোনো কারণে কারো পক্ষে কখনো ফরয সালাত ও সুন্নাত/নফল সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে সুন্নাত/নাফল সালাত ছেড়ে দিয়ে কেবল ফরয সালাত আদায় করবে। অনুরূপভাবে অফিসের নির্ধারিত পেশাগত দায়িত্ব ও নফল ‘ইবাদাত। এ দুটি কাজের মধ্যে অফিসের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন

করা শার'য়ী ও নৈতিকভাবে ওয়াজিব এবং নফল 'ইবাদত ইচ্ছাধীন ব্যাপার। যদি কারো পক্ষে এ দুটি কর্তব্য একসাথে পালন করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে নফল 'ইবাদত ছেড়ে দিয়ে অফিসের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করবে।

ক. ৪. 'ইবাদতের স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতের তুলনায় মূল 'ইবাদতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাত অগ্রগণ্য

যদি এক সাথে দুটি সুন্নাত আদায়ের প্রসঙ্গ চলে আসে এবং এ দুটি একসাথে আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতটি ছেড়ে দিয়ে মূল 'ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাতটি আদায় করতে হবে। যেমন- বাইতুল্লাহর একান্ত নিকটে গিয়ে তাওয়াফ করা এবং তাওয়াফের সময় রমল করা দুটিই সুন্নাত। তবে প্রথমটি হলো স্থানের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাত এবং দ্বিতীয়টি হলো মূল 'ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাত। যদি বাইতুল্লায় প্রচণ্ড ভীড় তৈরি হয়, তাহলে বাইতুল্লাহর পাশ থেকে একটু দূরে সরে গিয়ে রমল করতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি দুটি সুন্নাতই মূল 'ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট হয় এবং একটির ওপর অপটির আলাদা কোনো বিশেষত্ব না থাকে, তাহলে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। এ কারণে কেউ যদি তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করের মধ্যে রমল করতে না পারে, তাহলে অনেক ফকীহের মতানুসারে শেষ চার চক্করের মধ্যে রমল করা তার জন্য মুস্তাহাব নয়। কেননা, শেষ চার চক্করের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে হাঁটাই হলো সুন্নাত। কাজেই শেষ চার চক্করের মধ্যে যদি রমল করা হয়, তাহলে শেষ চক্করের মধ্যে হাঁটার সুন্নাত পরিত্যাগ করা হলো। এভাবে কোনো 'ইবাদতের মধ্যে কোনো সুন্নাত পালনের জন্য অপর কোনো সুন্নাত পরিত্যাগ করা যাবে না। কারণ হলো, এখানে দুটি সুন্নাতই মূল 'ইবাদাতের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং একটির ওপর অপরটির কোনো বিশেষত্ব নেই (Al-Zarkashī 1405H, 1/344; Ibnu Qudāmah ND, 9/95)।

ক. ৫. কোনো মাকরূহ কিংবা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার তুলনায় মুস্তাহাব তরক করা উত্তম

যদি কোনো মুস্তাহাব আদায় করতে গেলে কোনো মাকরূহ কিংবা হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে মুস্তাহাব কাজটি ছেড়ে দিতে হবে (Sulaymān ND, 579)। কারণ, শারী'আতের মধ্যে মুস্তাহাব কাজের ফযীলত লাভ করার চেয়ে মাকরূহ বা হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব অনেক বেশি। ফিকহের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো- درء المفاسد أولى من جلب المصالح. "কল্যাণ লাভের চেয়ে ক্ষতি দূর করা শ্রেয়" (Ibn Nujaym 2000, 90)। এ নীতির একটি উদাহরণ হলো- তাওয়াফের সময় মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে নামায পড়া সুন্নাত। কিন্তু ভীড়ের সময় মাকামে ইব্রাহীমের পেছনে নামায পড়ার চেয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে নিরাপদ স্থানে নামায পড়াই শ্রেয়।

ক. ৬. জায়িয বা মুবাহ কাজে লিপ্ত হওয়ার চেয়ে বিদ'আত বর্জন অগ্রগণ্য

যদি কোনো জায়িয বা মুবাহ কাজ আদায় করতে গেলে কোনো বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে জায়িয বা মুবাহ কাজটি ছেড়ে দিতে হবে। যেমন- প্রচলিত যিকরে জলী। যিকর- উচ্চস্বরে হোক বা অনুচ্চস্বরে- সাধারণত জায়িয; কিন্তু উচ্চস্বরে যিকর যখন একটি ধর্মীয় রীতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে, তখন তা বিদ'আতে পরিণত হবে। এ অবস্থায় তা বর্জন করতে হবে। অনুরূপভাবে কোনো সুন্নাত আদায় করতে গেলে যদি কোনো বিদ'আতে লিপ্ত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা দেখা দেয়, তবে সুন্নাত ছেড়ে দিতে হবে। ইমাম 'আলাউদ্দীন আল-কাসানী [মৃ. ৫৮৭ হি.] রহ. বলেন,

أَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي التَّرْكِ لَا فِي الْإِتْيَانِ؛ لِأَنَّ تَرْكَ السُّنَّةِ أَوْلَى مِنْ إتْيَانِ الْبِدْعَةِ.

> কোনো বিষয় সুন্নাত না কি বিদ'আত- তা নিয়ে সন্দেহ দেখা গেলে সতর্কতা হলো তা বর্জন করার মধ্যে; পালন করার মধ্যে নয়। কেননা, বিদ'আত সম্পাদন করার চেয়ে সুন্নাত ত্যাগ করাই অধিকতর শ্রেয় (Al-Kasani 1982, 2/63)।

ক. ৭. বিরোধপূর্ণ কাজের তুলনায় বিরোধমুক্ত কাজ অগ্রগণ্য

যদি দুটি কাজের মধ্যে একটি নিয়ে ইমামগণের মতবিরোধ থাকে এবং অপর কাজের ব্যাপারে কারো দ্বিমত না থাকে, তাহলে বিরোধমুক্ত কাজটি প্রাধান্য পাবে। যেমন- আইয়ামে তাশরীকের মধ্যে সূর্য হেলে যাওয়ার পর জামরাগুলোতে পাথর নিক্ষেপ বিধিবদ্ধ হবার ব্যাপারে কারো কোনো দ্বিমত নেই, পক্ষান্তরে সূর্য হেলে যাওয়ার আগে পাথর নিক্ষেপের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। কাজেই এ ক্ষেত্রে সূর্য হেলে যাওয়ার পর জামরাগুলোতে পাথর নিক্ষেপ অগ্রগণ্য হবে।

ক. ৮. হাজিয়্যাত ও তাহসীনিয়্যাতের তুলনায় জরুরিয়্যাত অগ্রগণ্য

যদি একসাথে বিভিন্ন প্রয়োজন ও চাহিদা দেখা দেয় এবং সব প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রথমে জরুরিয়্যাতকে, অতঃপর হাজিয়্যাতকে প্রাধান্য দিতে হবে। এ নীতি ব্যক্তির প্রয়োজন ও চাহিদার ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি দীনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেমন- নফল হজ্জের তুলনায় দীনের হিফাযতের প্রয়োজনে ইসলামের সঠিক প্রচার-প্রসার ও এর বিরুদ্ধে পরিচালিত ষড়যন্ত্রসমূহের মোকাবেলার কাজে নিজের অর্থসম্পদ ব্যয় করা শ্রেয়।

খ. লাভ-ক্ষতির তারতম্য অনুসারে কাজের অগ্রাধিকার

লাভ-ক্ষতি ও কল্যাণ-অকল্যাণের তারতম্য অনুসারে কাজের অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য ইমামগণ বিভিন্ন নীতি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও মানদণ্ড গুলো হলো-

খ. ১. পরকালের জন্য কল্যাণকর-এরূপ অধিকতর উত্তম কাজকে অগ্রাধিকার দান

যদি পরকালে কল্যাণে আসে- এরূপ কয়েকটি কাজ একসাথে মিলিত হয়, তবে সম্ভব হলে সব কাজ করার চেষ্টা করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয়, তাহলে তন্মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ কাজকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে। যেমন- ফরয সালাত ও নফল সালাত। এ দু ধরনের 'ইবাদাতের মধ্যে যদি অনিবার্য কোনো কারণে কারো পক্ষে কোনো সময় ফরয সালাত ও নফল সালাত আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে সে নফল সালাত ছেড়ে দিয়ে কেবল ফরয আদায় করবে।

খ. ২. অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর কাজকে সম্পাদন করা

যদি কারো ওপর কখনো ক্ষতিকর কয়েকটি কাজ এক সাথে আপতিত হয়, তবে সম্ভব হলে সেসব ক্ষতিকর কাজ অপসারণের চেষ্টা করবে। যদি তার পক্ষে সবক'টি ক্ষতিকর কাজ অপসারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে অপেক্ষাকৃত বেশি ক্ষতিকর কাজটি দূরীভূত করে কম ক্ষতিকর কাজটি সম্পাদন করবে। যেমন- ধরুন, মুহরিমের সামান্য পানি আছে, তা দিয়ে হয়তো সে নিজের অপবিত্রতা দূরীভূত করতে পারবে অথবা তার শরীরে লাগা সুগন্ধি ধৌত করতে পারবে। এমতাবস্থায় সে ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধির ব্যবহার থেকে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তা দিয়ে শরীরে লাগা সুগন্ধি ধৌত করবে, আর নিজের অপবিত্রতা দূরীভূত করার জন্য তায়াম্মুম করবে ('Izzuddīn ND, 1/79-80)।

খ. ৩. অকল্যাণের তুলনায় কল্যাণ অগ্রগণ্য

যদি কোনো বিষয়ে কিছু কল্যাণও থাকে, আবার কিছু অকল্যাণও থাকে, তবে সম্ভব হলে অকল্যাণগুলো দূরীভূত করে কল্যাণগুলো অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। যদি অকল্যাণ দূরীভূত করে কল্যাণগুলো অর্জন করা সম্ভব না হয়, তাহলে দেখতে হবে, অকল্যাণের মাত্রা কল্যাণের মাত্রার চেয়ে বেশি কিনা? যদি অকল্যাণ বেশি হয়, তবে তা সর্বতোভাবে ত্যাগ করতে হবে, যদিও এতে কল্যাণগুলো ছুটে যায়। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা মদ ও জুয়াকে হারাম করেছেন। এগুলোতে কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণই বেশি। যদি অকল্যাণের চেয়ে কল্যাণই বেশি হয়, তবে সামান্য অকল্যাণকে মেনে নিয়ে কল্যাণ অর্জনের চেষ্টা করতে হবে। যদি কল্যাণ ও অকল্যাণ দুটিই সমান হয়, তবে বান্দাহর জন্য যে কোনো একটি এখতিয়ার করার স্বাধীনতা থাকবে, চাইলে সে বিরতও থাকতে পারে। যেমন- হারাম ঘোষিত অঞ্চলের মধ্যে শিকার জবাই করা কিংবা ইহরাম অবস্থায় শিকার করা নিষিদ্ধ ও মন্দ কাজ; কিন্তু একান্ত বাধ্যগত অবস্থায় তা জা'য়িয। কারণ, প্রাণীর সম্মান রক্ষার চেয়ে মানুষের প্রয়োজন পূরণ অগ্রগণ্য ('Izzuddīn ND, 1/83-84)।

গ. হকদারদের মর্যাদা অনুসারে কাজের অগ্রাধিকার

ব্যক্তির অবস্থা ও হকদারদের মর্যাদা অনুসারে কাজের অগ্রাধিকার দেয়ার জন্য ইমামগণ বিভিন্ন নীতি ও মানদণ্ড নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও মানদণ্ড গুলো হলো-

গ. ১. পরকালের কল্যাণের ক্ষেত্রে বান্দার হকের তুলনায় আল্লাহর হক অগ্রগণ্য

যদি কখনো একসাথে বান্দাহর হক ও আল্লাহর হক আদায়ের প্রসঙ্গ আসে এবং দুটিই একসাথে আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে আল্লাহর হককে প্রাধান্য দিতে হবে, যদি এতে পরকালে বান্দাহর কল্যাণ নিহিত থাকে ('Izzuddīn ND, 1/146)। যেমন- হজ্জের বিধান। এতে যদিও বাহ্যত বান্দার আর্থিক ক্ষতি ও শারীরিক ক্লেশ রয়েছে, কিন্তু তা আখিরাতে বান্দাহর জন্য কল্যাণকর। এ কারণে আর্থিক ক্ষতি ও শারীরিক ক্লেশ স্বীকার করে হলেও হজ্জ আদায় করতে হবে।

গ. ২. দুনিয়ার কল্যাণের ক্ষেত্রে আল্লাহর হকের তুলনায় বান্দার হক অগ্রগণ্য

যদি কখনো এক সাথে বান্দার হক ও আল্লাহর হক আদায়ের প্রসঙ্গ আসে এবং দুটিই একসাথে আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে বান্দার হককে প্রাধান্য দিতে হবে, যদি এতে দুনিয়ায় বান্দার জন্য যথার্থ কল্যাণ নিহিত থাকে। যেমন- হজ্জ ও ঋণ পরিশোধ। কাজেই কারো কাছে যদি হজ্জ ফরয হবার মতো নগদ অর্থ-সম্পদ থাকে; কিন্তু সে ঋণগ্রস্ত হয়, তাহলে সে হজ্জ সম্পাদন না করে আগে ঋণ পরিশোধ করবে।

গ. ৩. পিতার হকের তুলনায় মাতার হক অগ্রগণ্য

যদি সামর্থ্য থাকে, তাহলে পিতামাতা দুজনেরই হক আদায় করার চেষ্টা করতে হবে। যদি একসাথে দুজনের হক আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে পিতার হকের ওপর মাতার হক আদায়কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এ কারণে 'আলিমগণ বলেন, বদলি হজ্জের ক্ষেত্রে পিতার তুলনায় মাতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, যদি দুজনের ওপরই হজ্জ ফরয হয়ে থাকে। আর বদলি নফল হজ্জের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে পিতার তুলনায় মাতাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

গ. ৪. ব্যক্তির হকের তুলনায় সমষ্টির হক অগ্রগণ্য

যদি দুটি কাজের মধ্যে একটি ব্যক্তিবিশেষের উপকারে আসে, আর একটি কাজ সমাজের জন্য উপকারে আসে এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের জন্য দুটি কাজই করা সম্ভব না হয়, তাহলে যে কাজটি সমাজের উপকারে আসে, তাকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেমন- ব্যক্তিগত সাধনা ও সমাজসেবা। এ দুটি কাজের মধ্যে ব্যক্তিগত সাধনা ব্যক্তির নিজের জন্য উপকারী, আর সমাজসেবা সমাজের মানুষের জন্য উপকারী। এ দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ স. বলেন,الخلق عيال الله ' فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله.- "সৃষ্টিজীব হল আল্লাহর প্রতিপাল্য স্বরূপ। অতএব, যে ব্যক্তি সৃষ্টির প্রতি সর্বাধিক কল্যাণ

করবে, সে-ই হচ্ছে আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয়" (Abū Ya'lā 1984, 6/65: 3315)। অন্য হাদীসে তিনি বলেন, الساعي على الأرملة و المسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار.-"বিধবা রমণী ও গরীব-দুঃখীদের সেবাকারীদের মর্যাদা ও সম্মান আল্লাহর পথে জিহাদকারী অথবা রাতভর নামায আদায়কারী ও দিনভর রোযা পালনকারীর মর্যাদার সমপর্যায়ভুক্ত" (Al-Bukhārī 2002, 1363, 5353; Muslim 2006, 2/1360,2982)। অনুরূপভাবে ব্যক্তিগত সাধনা ও 'ইলম চর্চারমধ্যে 'ইলম চর্চা অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ ও কল্যাণকর। কারণ, 'ইলম চর্চার উপকার ও কল্যাণ যেমন নিজেও পাবে, তেমনি সমাজ ও জাতিও তা দ্বারা উপকৃত হবে। এ কারণে শারী'আতে 'ইলম চর্চার প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই রাসূলুল্লাহ স. বলেন, تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها.-"রাতে এক ঘণ্টা জ্ঞান চর্চা করা রাতভর ইবাদত করার চাইতে উত্তম" (Al-Dārimī 1407H, 1/94, 264)।

অগ্রাধিকার বিচারের যোগ্যতা ও শর্তাবলি

শারী'আতের বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করার জন্য কতিপয় শর্ত মেনে চলা প্রয়োজন, যাতে এ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায়। নিম্নে এতদসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ শর্তগুলো উলেস্নখ করা হলো-

ক. যোগ্য ও বিশেষজ্ঞ হওয়া

শারী'আতসম্মত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্যতা বিচার একটি কঠিন কাজ। কাজেই এ ক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সিদ্ধান্ত দেওয়ার মতো গভীর জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকতে হবে। এ কারণে তাঁর মধ্যে যেমন ইজতিহাদের জন্য প্রয়োজনীয় সকল জ্ঞান ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, তেমনি বাস্তব অবস্থা বোঝার মতো তীক্ষ্ণ মেধা শক্তিও থাকা প্রয়োজন। কিন্তু বর্তমানে এ শর্ত পাওয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে কতিপয় বাস্তব সমস্যা লক্ষ্য করা যায়। যেমন-

ক. ১. ইজতিহাদের আকাল

শারী'আতসম্মত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচার নিঃসন্দেহে ইজতিহাদের একটি প্রকরণ। এ গুরু কাজ সম্পাদনের জন্য একজন ফিকহগবেষককে যেমন *ফিকহুল মুওয়াযানা*, *ফিকহুল ওয়াকি'*, *ফিকহুল মাকাসিদ*, *ফিকহুন নুসূস*, *ফিকহুত তা'আরুয ওয়াত তারজীহ* প্রভৃতি ফিকহী শাস্ত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ হতে হবে, তেমনি ইজতিহাদের সাথে সংশিস্নষ্ট অন্যান্য বিষয় সম্পর্কেও তাঁকে অভিজ্ঞ হতে হবে। কিন্তু উসূলের কিতাবগুলোতে একজন মুজতাহিদের জন্য প্রয়োজনীয় যেসব যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করা হয়েছে, সেসব অর্থে অধুনা কোনো মুজতাহিদ পাওয়া যাওয়া কঠিন, অন্ততপক্ষে এ জাতীয় যোগ্য লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অল্প। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ ক্ষেত্রে সমাধান কী? আমরা মনে করি

যে, এ ক্ষেত্রে সমাধান হলো, আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফিকহ একাডেমি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর উদ্যোগে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা। এগুলোতে বিশ্বের প্রত্যেক মাযহাবের খ্যাতিমান বিদগ্ধ ইসলামী ফকীহ ও গবেষকগণ দীর্ঘ আলোচনা-পর্যালোচনার মাধ্যমে এ জাতীয় বিষয়সমূহে একটি সম্মিলিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন। আমরা আরো মনে করি যে, অধুনা এ জাতীয় বিষয়গুলো ব্যক্তিবিশেষের মতের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এতে ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যই বাড়বে। কাজেই এ ক্ষেত্রে নিরাপদ ব্যবস্থা হলো- সামষ্টিক ইজতিহাদ (الاجتهاد الجماعي)।

ক. ২. বাস্তবতা অনুধাবনে অক্ষমতা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, শারী'আতসম্মত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচার অনেকাংশে মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণ, লাভ-ক্ষতি ও সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতির তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। এ ক্ষেত্রে প্রায়ই ফকীহদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে বৈপরীত্য দেখা যায়। কেউ কোনো কাজকে অধিকতর ক্ষতিকর মনে করলেও অপর ফকীহ সেটিকে সেভাবে ক্ষতিকর মনে করছেন না, অনুরূপভাবে কেউ কোনো কাজকে অধিকতর কল্যাণকর মনে করলেও অপর একজন ফকীহ সেটিকে সেভাবে কল্যাণকর মনে করছেন না। তদুপরি অনেক ফকীহই যুগের নতুন নতুন আবিষ্কার, চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাও পরিবর্তন সম্পর্কে সম্যক ধারণা রাখেন না। ফলে তাঁদের মধ্যে এ জাতীয় বিষয়গুলোর লাভ-ক্ষতির মাত্রা নির্ধারণ নিয়েও মতপার্থক্য দেখা যায়। তা হলে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এ সমস্যার সমাধান কীভাবে হবে? আমরা মনে করি, এখানেও সমাধানের পথ হলো, সামষ্টিক ইজতিহাদ। ফিকহ একাডেমি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের সেমিনার ও সভাগুলোতে বিজ্ঞ ফকীহগণের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নির্ভরযোগ্য বিশেষজ্ঞগণকেও দাওয়াত জানাবে এবং তাঁদের থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাখ্যা ও লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করবে।

খ. মৌলিক ও প্রধান দলীলগুলোর ওপর নির্ভর করা

শারী'আতের বিভিন্ন বিষয়ের অগ্রগণ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য শারী'আতের মৌলিক ও প্রধান দলীলসমূহের ওপর নির্ভর করা প্রয়োজন। বর্তমানে মুসলিম উম্মাত বিভিন্ন ধরনের মতপার্থক্য ও দলাদলিতে লিপ্ত, আবার অনেকেই দীনের সঠিক রূপ থেকেও অনেক দূরে সরে পড়েছে। এমনকি দীনের বড় বড় দা'য়ী ও সংস্কারকদের মধ্যেও কেউ কেউ এ বিচ্যুতি থেকে মুক্ত নন। তাঁরা নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম-নীতির অনুসরণ ছাড়াই নিজেদের সংকীর্ণ চিন্তা-চেতনা কিংবা অপরিণত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে নানারূপ মনগড়া সিদ্ধান্ত পেশ করে থাকেন। এ অবস্থায় তাঁরা যাকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন, তাকে গুরুত্বহীন বিবেচনা করে ত্যাগ করে, পক্ষান্তরে

যে বিষয়ের গুরুত্ব কম, তাকে অধিক অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। ফলে এর সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায় তাদের গৃহীত নানা কর্মসূচি ও কার্যকলাপে। এভাবে ইসলামের মধ্যে যুগে যুগে দীনের মধ্যে নানা বিদ'আত ও কুসংস্কারও ঢুকে শিকড় গেড়ে বসেছে। এ কারণে এ বিভ্রান্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে কেবল শারী'আতের মৌলিক ও প্রধান দলীলগুলোর ওপর নির্ভর করতে হবে।

গ. কাজগুলো সমমর্যাদা সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে দলীল না থাকা

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, শারী'আতে দৃষ্টিতে সাধারণত সকল কাজ ও বিধিবিধান সমমর্যাদা সম্পন্ন নয়। এগুলোর মধ্যে গুরুত্ব ও মর্যাদাগত তারতম্য রয়েছে। কাজেই নির্দিষ্ট কোনো শার'য়ী দলীল দ্বারা কোনো বিষয়ে যদি জানা যায় যে, দুটি কাজ বা দুটি বিধানই সমমর্যাদাসম্পন্ন ও একই গুরুত্ববহ এবং লাভ-ক্ষতির দিক থেকেও সমান, তাহলে এ দুটি কাজের মধ্যে কোনো একটি কাজকেই অপর কাজের ওপর প্রাধান্য দেওয়া যাবে না। এ ক্ষেত্রে বান্দার জন্য যে কোনো একটি কাজ বেছে নেওয়ার এখতিয়ার থাকবে। এ ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে উত্তম বিধান কোনটি? তা তালাশের প্রয়োজন নেই। যেমন- আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾

(হজ্জের) নির্দিষ্ট কয়েকটি দিনে (তাকবীর পড়ার মাধ্যমে) আল্লাহকে স্মরণ করো। (হজ্জের পর) যদি কেউ তাড়াহুড়া করে দু দিনের মধ্যে (মিনা থেকে মক্কায়) ফিরে আসে, তাতে (যেমন) কোনো দোষ নেই, (তেমনি) যদি কোনো ব্যক্তি সেখানে আরো বেশি অপেক্ষা করতে চায়, তাতেও কোনো দোষ নেই। (এ নিয়ম হচ্ছে) তার জন্য, যে আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করেছে। তোমরা আল্লাহকেই ভয় করো এবং জেনে রেখো, একদিন তোমাদের অবশ্যই তাঁর কাছে জড়ো করা হবে (Al-Qur'ān, 2:203)।

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, মিনা থেকে পাথর নিক্ষেপ করে দ্বিতীয় দিনেও চলে আসতে পারবে এবং তৃতীয় দিন চলে আসলেও কোনো অসুবিধা নেই। এখানে দুটি কাজকে সমানভাবে মূল্যায়ন করা হয়েছে। কাজেই এ দুটি কাজের মধ্যে একটিকে অপরটির ওপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

ঘ. শারী'আতের উদ্দেশ্যাবলির প্রতি লক্ষ্য রাখা

শারী'আতসম্মত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচারকালে শারী'আতের উদ্দেশ্যাবলির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে এ সিদ্ধান্ত শারী'আতের উদ্দেশাবলির স্তর ও মর্যাদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় এবং কোনোভাবেই শারী'আতের উদ্দেশ্যাবলির

পরিপন্থী না হয়; অধিকন্তু তা শারী'আতের যে কোনো উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কার্যকর ভূমিকা রাখে। বস্তুতপক্ষে মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট কাজগুলোর মধ্যে কোন্ কাজের কী গুরুত্ব এবং কোন্ কাজকে কোন্ পর্যায়ে স্থান দিতে হবে এবং কোথায় কোন্ কাজ কল্যাণকর, আর কোথায় কোন্ কাজ অকল্যাণকর? কার জন্য কী কাজ উপযোগী এবং কী কাজ উপযোগী নয়? এসব প্রশ্নের উত্তর *'মাকাসিদুশ শারী'আহ'* থেকেই জানা যায়। এ কারণেই 'আলিমগণ *'ফিকহুল আউলাভিয়্যাত'* চর্চার জন্য *'মাকাসিদুশ শারী'আহ'* সম্পর্কে গভীর জ্ঞান থাকার শর্তারোপ করেছেন।

ঙ. অগ্রগণ্যতাজ্ঞাপক কোনো শার'য়ী দলীলের পরিপন্থী না হওয়া

কোনো শার'য়ী দলীল দ্বারা কোনো বিষয়ে যদি জানা যায় যে, তা অগ্রগণ্য ও শ্রেষ্ঠতর কিংবা অধিকতর কল্যাণকর, তাহলে এর ওপর অন্য বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া যাবে না। যেমন- রাসূলুল্লাহ স. বলেন, فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي-''রমযান মাসে একটি 'উমরাহ সম্পাদন আমার সাথে হজ্জ করার সমতুল্য'' (Al-Bukhārī 2002, 448-449, 1863)।

এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. রমযান মাসে 'উমরাহ সম্পাদনকে একটি অধিক মর্যাদাপূর্ণ কাজ হিসেবে উলেস্নখ করেছেন। কাজেই 'উমরাহ সম্পাদনের জন্য রমযানের তুলনায় অন্য মাসকে উত্তম বলে সাব্যস্ত করা যাবে না।

চ. বিশুদ্ধ তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করা

শারী'আতসম্মত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অগ্রগণ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচারকালে বিশুদ্ধ তুলনামূলক পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে। বলতে গেলে, *ফিকহুল আউলাভিয়্যাত* পুরোটাই তুলনামূলক ফিকহের ওপর ভিত্তিশীল এবং এর ফসল। কারণ, সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোর মধ্যে কোন্ বিষয়টি অধিকতর উত্তম, গুরুত্বপূর্ণ ও শ্রেয়? কোন্টি কল্যাণকর এবং কোনটি অকল্যাণকর? কোন্ কাজে কল্যাণের মাত্রা বেশি, আর কোন্ কাজে কম? কোন্ কাজে অকল্যাণের মাত্রা কম, আর কোন্ কাজে বেশি? এসব বিষয় কেবল পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে জানা যেতে পারে। এ কারণে এ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হলে তুলনার কাজটি বিশুদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হতে হবে।

ছ. ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভ করা

সমাজের সব মানুষের অবস্থা এক ও অভিন্ন নয়। কেউ শক্তিশালী আর কেউ দুর্বল; কারো বুদ্ধি-বিচার ক্ষমতা বেশি আর কারো কম; কেউ যোগ্য আর কেউ অযোগ্য; কেউ সচ্ছল আর কেউ অসচ্ছল; কেউ সুস্থ আর কেউ রুগ্ন; কারো বিশেষ কোনো কাজের প্রতি আগ্রহ থাকে আর কারো থাকে না; ..। এ কারণে ক্ষেত্রবিশেষে কোনো কাজ কারো জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হলেও অপরের জন্য তা উপযুক্ত বিবেচিত হয়

না। কাজেই যে ব্যক্তি যে কাজের জন্য অধিকতর উপযুক্ত, তাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সে কাজের দায়িত্ব আরোপ করা দরকার। যেমন- কারো মেধা ও বুদ্ধি-বিচার ক্ষমতা বেশি, তাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও এ ক্ষেত্রে বুৎপত্তি লাভের জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে। পক্ষান্তরে যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য ও সাহসিকতা দান করেছে, তাকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে দেশ রক্ষায় যুদ্ধের জন্য বেছে নেওয়া যেতে পারে। ..এভাবে অন্যান্য কাজও। এ পদ্ধতিতেই মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

সমাজের অবস্থাও অনুরূপ। কোনো সমাজের অধিকাংশ মানুষ শিক্ষিত ও সচ্ছল, আবার কোনো সমাজের অধিকাংশ মানুষ অশিক্ষিত ও দারিদ্র্যপীড়িত; কোনো সমাজের অধিকাংশ মানুষ ধর্মপরায়ণ ও নীতিবান, আবার কোনো সমাজের অধিকাংশ মানুষ ধর্মবিদ্বেষী ও নীতিভ্রষ্ট; কোনো সমাজে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, আবার কোনো সমাজে তারা সংখ্যালঘু ও নির্যাতিত। কোনো সমাজের মুসলমানগণ দেশের মূল নাগরিক, আবার কোনো সমাজের মুসলমানগণ অভিবাসী। সুতরাং যে সমাজের জন্য যে কাজ ও বিধানটি অধিকতর উপযোগী ও কল্যাণকর, তাই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এখতিয়ার করতে হবে। যেমন- সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামের শক্তিবৃদ্ধি ও মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে অমুসলিমদের মনস্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত তাদেরকে যাকাতের অর্থ-সম্পদ দেয়া সমীচীন নয়, পক্ষান্তরে যেসব দেশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু ও নির্যাতিত, সেসব জায়গায় ইসলামের শক্তিবৃদ্ধি ও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে তাদের মনস্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত যাকাত থেকে অর্থ-সম্পদ দান করা বৈধ হবে।

আমরা লক্ষ্য করি যে, শারী'আতের বিভিন্ন নির্দেশের মধ্যেও ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। যেমন- ব্যভিচারের ক্ষেত্রে ব্যভিচারী ও ব্যাভিচারিণী অবিবাহিত হলে একশতটি বেত্রাঘাত এবং বিবাহিত হলে প্রস্তর নিক্ষেপে হত্যার শাস্তি নির্ধারণ করা হয়। বস্তুতপক্ষে এরূপ চিন্তা থেকে যখনই শ্রেষ্ঠ ও উত্তম 'আমল সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তখন তিনি ব্যক্তি ও সমাজের অবস্থা বিচার করে জবাব দিতেন। হাদীসের বিশিষ্ট ভাষ্যকার হাফিয ইবনু হাজার আল-'আসকালানী [৭৭৩-৮৫২ হি.] রহ. এর কারণ প্রসঙ্গে বলেন,

> وإنما اختلف الجواب لاختلاف أحوال السائلين بان أعلمَ كلَّ قوم بما يحتاجون إليه، أو بما لهم فيه رغبة، أو بما هو لائق بهم، أو كان الاختلاف باختلاف الأوقات بان يكون العمل في ذلك الوقت أفضل منه في غيره فقد كان الجهاد في ابتداء الإسلام أفضل الأعمال لأنه الوسيلة إلى القيام بها والتمكن أدائها وقد تضافرت النصوص على أن الصلاة أفضل من الصدقة ومع ذلك ففي وقت مواساة المضطر تكون الصدقة أفضل
>
> প্রশ্নকারীদের বিভিন্ন অবস্থাভেদে তাঁর জবাবও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। কেননা, তিনি সবচেয়ে বেশি জানতেন যে, লোকদের মধ্যে কাদের কী প্রয়োজন, কাদের কোন্ বিষয়ের প্রতি আগ্রহ রয়েছে অথবা কারা কোন কাজের উপযুক্ত। অথবা জবাবের বৈচিত্র্য বিভিন্ন সময়ের পার্থক্যের কারণেও হতে পারে। হয়তো একটি কাজ ঐ সময়ের জন্য উত্তম ছিল; কিন্তু অন্য সময়ের জন্য তা ছিল না। যেমন- ইসলামের প্রাথমিককালে জিহাদ ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। কেননা, তখন এ জিহাদই ছিল আমলগুলো সম্পাদনের একমাত্র মাধ্যম এবং এর সাহায্যেই তাঁরা অন্য আমলগুলো সম্পাদনের শক্তি সঞ্চয় করতেন। কুর'আন ও হাদীসের বহু দলীল দ্বারা এ কথা সুপ্রমাণিত যে, সালাত যাকাতের চেয়ে শ্রেয়। কিন্তু সংকটাপন্ন ব্যক্তির প্রতি সহমর্মিতা প্রদর্শনের একান্ত প্রয়োজন হলে যাকাতই শ্রেয়তর কাজে পরিণত হয় (Al-'Asqalānī 1379H, 2/9)।

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে জানা যায় যে, শারী'আতের বিষয়সমূহের অগ্রগণ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের জন্য একজন মুজতাহিদের অবশ্যই মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন।

উপসংহার

শার'য়ী বিধানসমূহের অগ্রাধিকার বিচার সংক্রান্ত জ্ঞান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ জ্ঞান যেমন সাম্প্রতিক কালের নানা ঘটনায় স্থান-কাল-অবস্থাভেদে অধিক কল্যাণকর ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজে সাহায্য করতে পারে, তেমনি তা ইসলামী আইনের কার্যকারিতা ও গুরুত্ব বৃদ্ধিতেও সহায়তা করতে পারে। তবে এ কাজ অত্যন্ত কঠিন। বর্তমানে ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এ কাজ করা দুরূহ এবং নিরাপদও নয়। এতে উম্মাতের মধ্যে ঐক্যের চেয়ে অনৈক্যই বাড়বে। এ অবস্থায় আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ফিক্হ একাডেমি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্মিলিতভাবে এ কাজের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

BIBLIOGRAPHY

Al-Qurān

Abū Ya'lā, Ahmad Ibn 'Alī Ibn al-Muthanna. 1984. *Al-Musnad*. Annotated by: Hussain Salīm Asad. Damascus: Dār al-Ma'mūn li al-Turāth.

Al-Baghdādī, al-Khatīb Abū Bakr. ND. *Al-Jāmi'u li Akhlāqir Rāwī wa Adābis Sāmi'*. http://www.alsunnah.com

Al-Bukhārī Abū 'Abdullah Muhammad Ibn Ismā'īl. 2002. Al-Jamī' Al-Sahīh. Beirut: Dār Ibn Kathīr.

Al-Dārimī, 'Abdullah Ibn 'Abdur Rahmān. 1407H. *Al-Sunan*. Annotated by: Fawwāz Ahmad Zamralī. Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī.

Al-Isfahānī, Rāghib Abul Qāsim al-Husayn. 1980. *Al-Zarī'atu Ilā Makārim al-Sharī'ah*. Beirūt: Dār al-Fikr.

Al-Kasani, `Alauddin, 1982. *Bada`eus Sana`e*, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah. 1995. Kuwait: Wazāarat al-Awqāf wa al-Shu´ūn al-Islāmiyyah.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. 2000. *Fī Fiqhil Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Daw´ al-Qur´ān wa al-Sunnah*. Al-Qāhirah: Maktabatu Wahbah.

Al-Shanqītī, 'Abdullah Ibnu Ibrāhīm. 1988. *Nashrul Bunūd 'Alā Marāqī al-Sa'ūd*. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Shātibī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsa al-Lakhmī al-Gharnātī. 1997. *Al-Muwāfaqāt fī Usūl Al-Sharī'ah*. Annotated by Abū 'Ubaydah Mashhūr Ibn Hasan Ālu Salmān. Cairo: Dāru Ibnu 'Affān.

Al-Wakīlī, Muhammad. 1997. *Fiqhul Awlawiyyāt: Dirāsah fī al-Dawābit*. Virginia: International Institute of Islamic Thought.

Al-Walīd, Ibnu 'Alī al-Husayn. 2009. *I'tibāru Ma´ālātil Af'āli wa Atharuhal Fiqhī*. Riyad: Dārut Tadammuniyyah.

Al-Zarkashī, Badruddīn Muhammad. 1405H. *Al-Mansūr fī al-Qawā'id*. Kuwait: Wazāarat al-Awqāf wa al-Shu´ūn al-Islāmiyyah.

Al-Zuhaylī, Wahbah. 1985. *Al-Fiqhul Islāmī wa Adillatuh*. Beirūt: Dār al-Fikr.

'Amīmul Ihsān, Muḥammad Muftī. 1986. *Qawā'idul Fiqh*. Karachi: Sadaf Publications.

Hajawī, Muḥammad Ibnul Hasan. 1340H. *Al-Fikr al-Sāmī fī Tārīkh al-Fiqh al-Islāmī*. Annotated by 'Abdul Fattāh al-Qārī. Al-Rabāt: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah.

Ibnu 'Ābidīn, Muḥammad Amīn. 1980. *Majmū'u Rasā´ili Ibnu 'Ābidīn*, Al-Rasā´il al-Saniyyah: 'Uqūdu Rasmil Muftī. Pakistan: Suhayl Academy.

Al-'Asqlānī, Ibn Hajar. 1379H. *Fathul Bārī*. Beirūt: Dār al-Ma'rifah.

Ibnu 'Abdil Barr, ND. *Bahjatul Majālis*, http://www.alwarraq. com

Ibnu Hazm, 'Alī al-Zāhirī. 1404H. *Al-Iḥkām fī Usūl al-Ahkām*. Al-Qāhirah: Dā al-Hadīth.

Ibnu Nujaym, Zaynuddīn. 2000. *Al-Ashbāh wa al-Nazā´ir*. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibnu Qudāmah, Shamsuddīn al-Maqdisī. ND. *Al-Sharhul Kabīr*. Al-Maktabat al-Shāmilah.

Ibn al-'Arabī, Abū Bakr Muḥammad Ibn 'Abdullah Ibn Muḥammad al-Mu'āfirī. 2002. *Aḥkāmul Qur´ān*. Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Ibnul Qayyim, Shamsuddīn Abū ‘Abdullāh Muhammad al-Jawziyyah. 1968. *I‘lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabbil ‘Ālamīn*. Al-Qāhirah: Maktabatul Kulliyyatil Azhariyyah.

Ibnul Qayyim, Shamsuddīn Abū ‘Abdullāh Muhammad al-Jawziyyah. 1973. *Madāridus Sālikīn*. Beirūt: Dārul Kitābil ‘Arabī.

Ibnul Qayyim, Shamsuddīn Abū ‘Abdullāh Muhammad al-Jawziyyah. 1971. *Ighāthat al-Lahfān*. Beirūt: Dār al-Ma‘rifah.

Ibnuṣ Salāh, ‘Amr ‘Uthmān. 1407H. *Adabul Muftī wa al-Mustaftī*. Annotated by Dr. Muwaffaq ‘Abdullah. Beirūt: Dār ‘Ālamil Kutub.

‘Izzuddīn, Ibnu ‘Abdis Salām. ND. *Qawā‘idul Ahkām fī Masālih al-Anām*. Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Jaddī, ‘Abdul Qādir. ND. *‘Amalul Muftī fi al-Nawāzil al-Mu‘āsarah*.

Mulhim, Muhammad Hammām ‘Abdur Rahīm. 2008. *Ta’sīl Fiqhil Awlawiyyāt: Dirāsah Maqāsidiyyah Tahlīliyyah*. Jordan: Dār al-‘Ulūm.

Muslim, Abū al-Husain Muslim Ibn Hajjāj Al-Qushairī Al-Nishapūrī. 2006. *Al-Musnad al-Sahīh*. Riyadh: Dār Tayyiba.

Riyād, Muhammad. 1423H. *Usūl Fatāwā wa al-Qadā’ fī al-Madhhabil Mālikī*. Al-Dārul Baydā: Matba‘at al-Najāhil al-Jadīdah.

Ruhul Amin, Muhammad. 2013. *Islami Ayner Utsoh*. Dhaka: Bangladesh Islamic Law Research Centre.

Sulaymān, Ibnu Muhammad Najrān. ND. 1st ed. *Al-Mufādalatu fī al-‘Ibādāt: Qawā‘id wa Tatbīqāt*. Riyād: Maktabat al-‘Ubaykān.